রাণুর প্রথম ভাগ

পূজ্যপাদ পিতৃদেব

এবং

পূজনীয়া মাতৃদেবীর

করপদ্মে

এই বইখানি

বিপুল সার্থকতার আনন্দের সহিত

সমর্পিত হইল।

দ্বারবঙ্গ

বৈশাখী-পূর্ণিমা, বঙ্গাব্দ ১৩৪৪

—গ্রন্থকার

রাণুর প্রথম ভাগ

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

রঞ্জন পাব্‌লিশিং হাউস

২৫।২ মোহনবাগান রো

কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ—বৈশাখ ১৩৪৪
পুনর্মুদ্রণ—অগ্রহায়ণ ১৩৪৭, আশ্বিন ১৩৫০, বৈশাখ ১৩৫২

মূল্য দুই টাকা

শনিরঞ্জন প্রেস
২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা হইতে
শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত
১১—৫. ৫. ৪৫

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

মাটি এবং মন লইয়া দেশ। বাংলা দেশের মাটি বড় ভিজা এবং মন বড় অশ্রুসিক্ত। আশার কথা, মাটি আর বেশি দিন ভিজা থাকিবে না ;—নদী, খাল, বিল সব জাহান্নমে চলিয়াছে।

মনের দিকটা।—যদি একদণ্ডও অশ্রুর ধারা একটু বন্ধ করা যায়, সেইজন্যই এই আয়োজনটুকু। আশা, না দুরাশা বুঝিতে পারিতেছি না।

বইখানির সমস্ত ইতিহাসের সঙ্গে দুইজনের নাম অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত,—এক 'প্রবাসী'র সহকারী সম্পাদক সোদরোপম শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, যিনি আমার বইয়ের কথা আমার চেয়ে ঢের বেশি ভাবিয়া আসিয়াছেন, আর দ্বিতীয় সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস, যাঁহার আগ্রহ ব্যতীত বইখানির প্রকাশ সম্ভব ছিল না। দুই-জনের নিকটেই গভীর কৃতজ্ঞতা জানানো রহিল।

গ্রন্থকার

সূচী

বিয়ের ফুল

১

রামতনু সাত-সাত জায়গায় মেয়ে দেখিয়া ফিরিল; কিন্তু পছন্দ আর হইল না। সবগুলিই জবুথবু হইয়া সামনে আসিয়া বসে; হাজার চেষ্টা করিলেও ভাল করিয়া দেখা হয় না, সেইজন্য হাজার সুন্দর হইলেও মনে কেমন একটু খুঁত থাকিয়া যায়। সন্দেহ হয়, আচ্ছা, এ যে চোখটা কোনমতেই বড় করিয়া চাহিল না, নিশ্চয়ই কোনও দোষ আছে; ওঁর যে খোঁপার এত ধুম, ওইখানেই গলদ নাই তো? ইত্যাদি।

নাহক এই সাত ঘাটের জল খাইয়া রামতনু বুঝিল, কন্যামননের এ প্রশস্ত উপায় নহে। একটা প্রশস্ত উপায় মনে মনে ঠাওরাইবার চেষ্টা করিতেছিল, এমন সময় বউদিদির মুখে একদিন শুনিল, তাঁহার সম্পর্কে এক পিসীর কন্যা সম্প্রতি প্রবেশিকা পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত পাস দিয়া জলপানি পাইয়াছে। রামতনু বেচারা এতদিন বেশির ভাগ পাড়াগেঁয়ে 'পুঁটী-খেঁদী'দেরই সন্ধান করিয়া ফিরিতেছিল, সুতরাং এখন খবর পাইয়া এই সুশিক্ষিতা যুবতীরত্নটির জন্য তাহার হৃদয় একেবারে পিপাসিত হইয়া উঠিল।

'দেখা নাই, বুঝা নাই, এইরূপ হইল কি করিয়া'—ইত্যাকার সন্দেহ যদি কাহারও মনে উদয় হয় তো কৈফিয়ৎ এই মাত্র দেওয়া যায় যে, প্রেম সব সময় চোখে দেখার তোয়াক্কা রাখে না—'হৃদয়-মরুভূমে' আপনার খেয়ালমতই গজাইয়া উঠে। তাই, বউদিদি সংবাদটি দিতে, একটু অশোভন হইলেও রামতনু প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল, কত বয়স তাঁর, দেখতে কেমন?

বউদিদি ইহাতে তাচ্ছিল্যের সহিত মুখটা ঘুরাইয়া বলিলেন, পোড়া কপাল, তোমার বুঝি অমনই নোলায় জল এল? পুরুষের সঙ্গে টেক্কা দিয়ে পাস করে, সে মেয়ের আবার বিয়ে! গলায় দড়ি জোটে না? কোন্ দিন বা কাছা-কোঁচা এঁটে পুরুষের সঙ্গে আপিসে বেরুবে!

রামতনু বেজায় অপ্রতিভ হইয়া পড়িল। বুঝিল, কথাগুলা বড় অসাময়িক হইয়া পড়িয়াছে। বয়স এবং চেহারার সহিত পাস দিবার বিশেষ সম্বন্ধ সে নিজেই তেমন খুঁজিয়া পাইল না। কথাগুলা তাহার মনের আকস্মিক উন্মাদনার খবরই বাহিরে প্রকাশ করিয়া দিয়াছে। সামলাইবার চেষ্টা করিয়া বলিল, না গো না, সে কথা নয়; কত বয়সে পাস দিয়েছে—তোমার গিয়ে, ষোল বছরের কমে—অর্থাৎ কিনা—

বউদিদি হাসিয়া ফেলিলেন।

রামতনু মুখ-চোখ রাঙা করিয়া আরও দুই-তিন বার 'অর্থাৎ কিনা' 'অর্থাৎ কিনা' করিয়া, তখনও বউদিদিকে হাসিতে দেখিয়া হঠাৎ চটিয়া উঠিল; বলিল, না বউদি, সব সময় ইয়ারকি ভাল লাগে না।

পূর্ব্বের মতই সুতীক্ষ্ন হাস্যসহকারে বউদিদি উত্তর করিলেন, বিশেষ ক'রে মনের অবস্থা যে সময় খারাপ, না? আহা, শুধু পাস-করা শুনেই বেচারীর এই দশা, যখন শুনবে চোদ্দ বছর বয়স, দেখতে পটের ছবিটির মতন, তার ওপর আবার পদ্য লিখতে পারে, তখন বোধ হয় মুচ্ছো যাবে।

মূর্চ্ছা যাইবার লক্ষণ রামতনুর তখনই প্রকাশ পাইতেছিল—রাগের চোটে; কোন রকমে আত্মসংবরণ করিয়া ঘর হইতে সক্রোধে বাহির হইয়া গেল।

এই ঘটনাটির পর ছোকরা হঠাৎ বড় নির্জ্জনতাপ্রিয় হইয়া উঠিল। বৈকালে দেখা গেল, সে মাঠে একলা ঘুরিয়া বেড়াইতেছে এবং সন্ধ্যার

সময় তাহাকে বড় একটা দেখাই গেল না। রাত্রে ডালের সহিত দুধ মাখিয়া এবং মাঝে মাঝে আলুর শাঁস বাদ দিয়া খোসা খাইয়া সে আহার শেষ করিল এবং তাহার পর বিছানার আশ্রয় লইল। রাত একটার সময়ও সে জাগিয়া মশারির চালে কল্পনার রঙিন ছবি আঁকিতেছে।

তাহার পরদিন কিন্তু মেঘ কাটিয়া গেল এবং রামতনুকে বেশ প্রফুল্ল দেখা গেল। স্পষ্টই বুঝিতে পারা গেল যে, সে রাতারাতি একটা মতলব আঁটিয়া ফেলিয়াছে। সে স্থির করিল, প্রজাপতির সহিত এ পর্য্যন্ত সাত-সাতটা বাজি হারিলেও আর এক হাত খেলিয়া দেখিবে। এবার আর পরের কথায় নাচিয়া চট করিয়া কন্যা দেখিতে ছুটিয়া তিক্ত মুখে ফিরিয়া আসা নয়। পূর্ব্বরাগের পালাটা দস্তুরমত শেষ করিয়া অন্য কথা। তবে দেরি আর কোনমতেই করা চলে না। সে মনশ্চক্ষে দেখিতে পাইল, এই বিদুষী তরুণীটির জন্য যুবকমহলে একটা চাঞ্চল্য পড়িয়া গিয়াছে; এবং স্বয়ম্বর-সভার প্রত্যেক প্রার্থীর মতন যদিও সে নিজেকেই সর্ব্বাপেক্ষা বাঞ্ছনীয় মনে করিল, তথাপি ভাবিল, না, দেরি করাটা নিরাপদ নয়। অভাবের মাথায় চাই কি এক অবাঞ্ছনীয়ের গলায়ই বরমাল্য পড়িয়া যাইতে পারে।

সকালবেলা একটু এদিক ওদিক করিয়া কাটাইল; তারপর হঠাৎ বউদিদির নিকট একটা পুরানো টেলিগ্রাম লইয়া গিয়া বিরক্তভাবে বলিল, এই নাও, যা মনে করেছিলুম তাই; আমায় আর থাকতে দিলে না।

টেলিগ্রাম দেখিয়া বউদিদির মুখটা শুকাইয়া গিয়াছিল। তিনি জিজ্ঞাসু নেত্রে চাহিয়া রহিলেন।

রামতনু বলিল, ভয় পাবার কিছুই নেই ; তবে আমায় কালই যেতে হবে।

কাল? এই বললে, বারো দিন দেরি আছে!

আমি বললেই তো আর হচ্ছে না, বিশ্বাস না হয় টেলিগ্রামটা পড়িয়ে নাও কাউকে দিয়ে।—বলিয়া, পাছে সত্যই কাহাকেও দিয়া পড়াইয়া লওয়া হয়, এই ভয়ে সেটা সঙ্গে সঙ্গে পকেটে পুরিল এবং হঠাৎ অধিকতর বিরক্তভাবে সেটাকে বাহির করিয়া টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া বলিল, আরে রামঃ, এমন কলেজেও মানুষে পড়ে!

এসব ব্যাপারে অনভিজ্ঞা বউদিদি সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, তা ভাই, কি করবে বল ; কামাই করাটা কি ভাল হবে? তোমার দাদা শুনে আবার চটবেন। কিন্তু এমন কেন হ'ল বল তো?

রামতনু পূর্ব্বের মতই রাগতভাবে বলিল, কে জানে? শুনেছিলাম, লাটসাহেব নাকি কলেজ দেখতে আসবে, তাই হবে বা।

বউদিদি রাগিয়া বলিলেন, মুয়ে আগুন লাটসাহেবের, সে আর মরবার সময় পেলে না! ঘরের ছেলে দুদিন ঘরে এসে বসবে, তাতেও সোয়াস্তি নেই!

যেন অকস্মাৎ মনে পড়িয়া গেল—এই ভাবে রামতনু বলিল, চুলোয় যাক ; হ্যাঁ, তোমার কোনও কাজ-টাজ আছে নাকি? তা হ'লে বল। তাই ব'লে আমি কিন্তু তোমার সেই পিসের বাড়িতে যেতে পারব না, সে আগে থাকতেই ব'লে রাখছি।

এই সরলহৃদয়া রমণী ভাবিলেন, কালকের ঠাট্টায় দেবর তাঁহার রাগ করিয়াছে। সেইজন্য সেইখানেই যাওয়াইবার জন্য বেশি জিদ করিয়া বসিলেন। ঠিকানা দিলেন, মাথার দিব্য দিলেন, এবং যাহাতে হাঁটিয়া যাইতে না হয় তাহার জন্য ভাড়াও কবুল করিলেন। রামতনুর

ঠিকানাটা লওয়াই উদ্দেশ্য ছিল ; সেটি মনে মনে মুখস্থ করিয়া লইল। বাহিরে কিন্তু খুব মাথা নাড়িয়া বউদিদিকে বলিল, সে হতেই পারে না, আমি সেখানে যেতেই পারব না ; তুমি আমায় তা হ'লে চেন নি।

পরদিবসই যাওয়া ঠিক হইল। দাদা তাহার বাড়িতে ছিলেন না। রামতনু ভাবিল, স্ত্রীর মুখে তিনি যখন এই উদ্ভট কথাটা শুনিবেন, তখন নিশ্চয়ই ভাবিবেন, রামতনু ভ্রাতৃজায়ার সহিত খুব একচোট ঠাট্টা করিয়া গিয়াছে ; ততদিনে সে একটা সুসঙ্গত কারণ খুঁজিয়া বাহির করিয়া ফেলিবে।

মা বধূমাতার মুখে শুনিলেন। অঞ্চলে চোখ মুছিয়া বলিলেন, রামুর আমার পড়াশোনার ঝোঁকটা চিরকালই এই রকম। আহা, ও কি বাঁচবে আমাদের পোড়া অদৃষ্টে? সবই ভাল বাছার, তবে ওই কেমন বিয়ের ফুল আর ফুটছে না!

২

যাহা হউক, কোর্টশিপ করিবার উদ্দেশ্যে সুটকেস, বিছানা, স্টীল ট্রাঙ্ক, টিফিন-কেরিয়ার ইত্যাদি গাদাখানেক লটবহর সমেত রামতনু কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করিল। হাওড়ায় পঁহুছিল সন্ধ্যার ঘণ্টা দেড়েক পূর্ব্বে। মনটা তাহার উৎসাহে পূর্ণ হইয়া উঠিল। এইবার তবে সে সেই বাঞ্ছিতার নিকট পঁহুছিল, যাহাকে আজ তিন দিন ধরিয়া কল্পনা ও স্বপ্নের মাঝে পরিপূর্ণ করিয়া ফেলিয়াছে। পুলটি পার হইলেই তাহার ওই তীর্থস্বরূপা নগরী! ওঃ, কাল এতক্ষণ!—ভাবিতেও অসহ্য সুখ!

অন্যমনস্কভাবে মালকোঁচা আঁটিয়া ভারনিপীড়িত কুলীটাকে একটা ধমক দিল ; এবং নিজেই বিছানার পুঁটুলিটা হাতে ঝুলাইয়া লইল। নিকটে একটা ছোঁড়া একটা ফিটনের দ্বার খুলিয়া অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইয়া ছিল। ভারটা নেহাত অসহ্য বোধ হওয়ায় রামতনু কিছু না বলিয়া সেটা দ্বারপথে সেই ফিটনের মধ্যে চালাইয়া দিয়া অগ্রগামী দূরবর্ত্তী কুলীটাকে ডাক দিল, ওরে বেটা, এদিকে—এখানে।

ছোঁড়াটা ব্যাপার দেখিয়া হতভম্ব হইয়া গিয়াছিল। এক্ষণে আবার কুলীটাকে গাড়ির দিকে আসিতে দেখিয়া অগ্নিশর্ম্মা হইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, এটা মালগাড়ি আছে নাকি বাবু—যেতো পারছো চাপাচ্ছো ? আমার আয়েশী বিলিতী ঘোড়া ; বাজে মাল টানতে পারবে না। তাহার পর রামতনুর সহিত অন্য লোক নাই দেখিয়া বলিল, আলবৎ, আদমি যেতো পারবে এসো, তাতে না বোলবার ছেলে নয়।—বলিয়া ঘোড়াটার চর্ম্মসার জঙ্ঘায় একটা চাপড় দিয়া বলিল, কি রে বেটা, না ?

রামতনু কথাটার প্রমাণের জন্য একবার 'আয়েশী বিলিতী' ঘোড়াটার পানে চাহিল, দেখিল, সে বেচারীও দীন নয়নে মোটগুলার দিকে চাহিয়া আছে। তাহার সুস্পষ্ট মোটা মোটা পঞ্জরের বেড়ার মধ্যে শিরাবহুল স্থূল পেটটি দেখিলেই বোধ হয়, সে তাহারই ভারে এত কাহিল যে, অন্য ভার বহিবার আর তাহার সামর্থ্য নাই। 'তবে বেঁধে মার, সয় ভাল'—ভাবটা যেন অনেকটা এই রকম গোছের।

কিন্তু অনুকম্পার এ অবসর নহে ; বরং দুই পয়সা ভাড়া বেশি দেওয়া যাইতে পারে, তাই সেই বালকের কথায় অনাদর দর্শাইয়া রামতনু বোঝাগুলি কুলীর মাথা হইতে নামাইতেছিল, এমন সময় এক

সাহেব-আরোহীর সহিত গাড়োয়ান স্বয়ং আসিয়া দেখা দিল। সুখের বিষয়, কোনও বচসা হইল না ; কারণ এই নবৈশ্বর্য্যগর্ব্বিত গাড়োয়ানটার সহিত আর বাক্যবৃদ্ধি নিরাপদ নহে জানিয়া রামতনু স্বহস্তেই বোঝাটি গাড়ি হইতে নামাইয়া লইল।

ফিটন চলিয়া গেল। চালকের পাশে আসিয়া সেই উদ্ধত ছোঁড়াটা একবার রামতনুর পানে চাহিয়া হাসিতে হাসিতে গাড়োয়ানটাকে কি একটা বলিল। কথাটা শুনিতে না পাইলেও রামতনু অপমানের আঘাতে বড় নিরুৎসাহ হইয়া পড়িল। তাহার বাঞ্ছিতার ছবিটি মনে এতই সজীব হইয়া পড়িয়াছিল যে, তাহার মনে হইল, যেন তাহার সম্মুখেই তাহাকে এই লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইতেছে।

কিন্তু নিরুৎসাহ হইলে কাজ চলে না। এদিকে সব গাড়িই প্রায় ভর্ত্তি হইয়া আসিতেছে। রামতনু কুলীটাকে বলিল, নে, ওঠা। ও বেটা আজ বড় বেঁচে গেল আমার হাত থেকে।

কুলীটা খপ করিয়া একটু নীচু হইয়া হাতজোড় করিয়া বলিল, না বাবু, আমায় চুকিয়ে দিন ; আপনি বোড়ো ফ্যাসাদে লোক আছেন।

গাড়োয়ানটার মত কুলীটারও অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন ছিল বলিতে হইবে। তাই অদূরে কয়েকজন ব্যর্থমনোরথ গাড়োয়ানকে সেই অভিমুখে হুড়াহুড়ি করিয়া আসিতে দেখা গেল, এবং তাহাদের মধ্যে একজন বিশেষ ক্ষিপ্রতার সহিত আগুয়ান হইয়া মালগুলিতে হাত রাখিয়া সঙ্গীগণকে শাসাইয়া দিল, বাস করো, মেরা সওয়ারি হ্যায়। এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার সহকারী বালককে ডাক দিল, এ ইসমাইল, আরে চল্ শা—।

তাহাকে লইয়াই এত কাড়াকাড়ি পড়িয়া গিয়াছে দেখিয়া রামতনু আবার বেশ সপ্রতিভ হইয়া উঠিল এবং গাড়ি আসিলে গদিতে একটা চাপ দিয়া বসিয়া বলিল, হাঁকাও।

ঘোড়ার পিঠে চাবুক কশিয়া গাড়োয়ান জিজ্ঞাসা করিল, কোথায় যেতে হোবে বাবু ?

রামতনু একেবারে আকাশ হইতে পড়িল। তাই তো, কোথায় যাইতে হইবে ? সর্ব্বনাশ ! এ কথাটা যে রামতনু নিজেই জানে না। কলেজের হস্টেলে যে তালা-আঁটা—এ কথা তো সে একবারও ভাবে নাই। কি বিভ্রাট ! এখন উপায় ? এদিকে সন্ধ্যা আগতপ্রায়, আর সঙ্গে এই এতগুলা অতিকায় মোট। এই তিন দিন পড়াশুনা ছাড়িয়া এত যে ছাইভস্ম চিন্তা করিল, তাহার মধ্যে এই এত বড় চিন্তাটা কি মনে একবারও স্থান দিতে নাই ?

কবিরা বলেন, প্রেম অন্ধ; তা যখন হইয়াছিল, তখন তো অন্ধ করিয়াইছিল, কিন্তু এখন সে নেশা কাটিয়া গেলেও রামতনু চক্ষে কিছু দেখিতে পাইল না। শরীর তাহার এলাইয়া পড়িল। গদিতে ঠেস দিয়া সে আকাশ-পাতাল ভাবিতে লাগিল; কিন্তু আকাশ-পাতালের মাঝখানে যে আপাতত কোথায় গিয়া দাঁড়াইবে, তাহা স্থির করিয়া উঠিতে পারিল না।

১৪ নম্বর বিপ্রদাস লেনের কথা একবার মনে হইল। কিন্তু সেখানে তো এ অবস্থায় গিয়া খোঁটা গাড়া চলে না। চলে না তো, কিন্তু উপায় ? কলেজ খুলিবার তো এখনও পুরা দশ দিন বাকি; এই দশ দিন কি গাড়িতে ঘুরিয়া বেড়াইবে ? তাহাতেও সে নয় রাজি; কিন্তু গাড়ির মালিক যে নামিয়া আসিয়া এখনই একটা মীমাংসা করিয়া লইবার জন্য উৎকট রকম পীড়াপীড়ি লাগাইয়া দিবে; দশ মিনিটও যাইতে দিবে না।

গাড়িটা স্টেশন ছাড়াইয়া বাহিরে আসিল। ইহার মধ্যে গাড়োয়ান আরও দুই-তিন বার মাথা ঝুঁকাইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, কোথায় যেতে

হোবে? কিন্তু কোন উত্তর না পাওয়ায় গাড়ি থামাইয়া নামিয়া আসিয়া রুক্ষভাবে জিজ্ঞাসা করিল, এ বাবু, আপনিও একটা মাল আছেন নাকি? কোথা বোলেন না যে? না, আমরা জ্যোৎখী আছি যে, বাড়ি চিনে লোবো?

ঘর্ম্মাক্তকলেবর রামতনু সোজা হইয়া বসিয়া ধীরভাবে বলিল, দাঁড়া না বাবা, ততক্ষণ তুই চল্ না সামনে, বলছি।

একটা অজানা বিপদের আশঙ্কায় ভীত হইয়া গাড়োয়ান বলিল, কি মোজার কোথা আছে! আপনি লামুন, আমি এ রোকোম সওয়ারি চাহে না। পরে ইসমাইলকে বলিল, উতার রে —লা বক্সা।

বিপদ যখন এতই আসন্ন হইয়া পড়িল, রামতনুর চট করিয়া একটা হোটেলের কথা মনে পড়িয়া গেল। সে বলিল, আঃ, চল্ না রে ২৫।৭ নম্বর মেছোবাজারে; আমার এই নম্বরটাই মনে পড়ছিল না।

৩

অপরাহ্ণকাল। 'নবদ্বীপ আশ্রম'-এর একটি ক্ষুদ্র কক্ষে রামতনু গালে হাত দিয়া গাঢ় চিন্তায় আচ্ছন্ন।

আকাশে মেঘ থমথম করিতেছে। অপরাহ্ণের তাবৎ চিহ্নগুলাই লোপ পাইয়াছে। রামতনুর মনটা বড় বিষণ্ণ। আজ সকালে এক পসলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছিল বলিয়া প্রিয়ার উদ্দেশে যাওয়া হয় নাই; আর এখনও এই দশা। কাজটাও এমন ধরনের নয় যে, একটা গাড়ি ভাড়া করিয়া যাওয়া চলে। যাক, যখন উপায় নাই, তখন আর কি হইবে?

পশ্চিমে হাওয়ায় মেঘগুলা পূর্ব্বপ্রান্তে জড় হইতেছিল। রামতনু শখ করিয়া ভাবিতেছিল, তাহার মানসপ্রতিমাও ওইদিকটাই আলো

করিয়া আছে। পুরাকালে এই মেঘ বিরহী যক্ষের সংবাদ যেমন তাহার প্রেয়সীর নিকট বহন করিয়া লইয়া গিয়াছিল, আজও যেন সেইরূপ রামতনুর মনোব্যথা বহন করিয়াই পূর্ব্বদিকে ১৪ নম্বর বিপ্রদাস লেনে তাহার প্রিয়ার পদতলে ঢলিয়া পড়িতেছে। আহা, তাহার বিরহেও এত সুখ!

রামতনুর কিন্তু মনে পড়িল, তাহার সহিত যখন একবারও দেখা হয় নাই, তখন এই মনগড়া বিরহ নিষ্ফল। প্রথমে কিরূপে দেখা-সাক্ষাৎ করা উচিত, সেইটিই ভাবিবার কথা। বাস্তবিক, আমি অমুকের দেওর—বলিয়া উঠিলে চলিবে না তো। না হয় পাঁচ মিনিট ধরিয়া বারান্দায় দাঁড়াইয়া পরিচয়ই দিল। তাহার পর যদি জিজ্ঞাসা করে, কি কাজ বাপু এখানে?

সাত-পাঁচ ভাবিয়া রামতনু স্থির করিল, পরিচয়টা যেন হঠাৎ হইয়া গেল—এইরূপ হইলেই ঠিক।

মিনিট কয়েক চিন্তার পর রামতনুর মাথায় একটা জমকালো মতলবের উদয় হইল। সেটা সংক্ষেপত এই—

সে এখনই বাহির হইয়া বিপ্রদাস লেনটা চিনিয়া লইবে। তাহার পর যতক্ষণ না বৃষ্টি নামে, এদিক ওদিক একটু পায়চারি করিবে; এবং বৃষ্টি নামিবামাত্রই গলিতে ঢুকিয়া পড়িবে ও চৌদ্দ নম্বর বাড়ির নিকট গিয়া আর যেন পারিল না, এই ভাবে তাহার বারান্দায় উঠিয়া পড়িবে। ইহাতে চাই কি শ্রীমুখে একটু 'আহা' এবং শ্রীহস্তপ্রদত্ত একটি শুষ্ক বস্ত্রেরও আশা করা যাইতে পারে। তাহা ছাড়া পরিচয়াদির সময়ও পাইবে অনেক।

তাহা হইলে আর দেরি করা চলে না। রামতনু তাড়াতাড়ি জুতা জামা পরিয়া বাহির হইয়া পড়িল। চারিদিকে মেঘের আড়ম্বর

দেখিয়া একবার মনে হইল, ছাতাটা লইয়া যায়; কিন্তু ভাবিল, তাহা হইলে ভাল জমিবে না।

ছোট বড় কতকগুলা গলি অতিক্রম করিয়া রামতনু কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে আসিয়া পড়িল। রাস্তার দুই দিকে বিপ্রদাস্ লেন খুঁজিতে খুঁজিতে সে উত্তর দিকে চলিল। মাঝে মাঝে আকাশের পানে চাহিয়া তাহার মনটা বড় দমিয়া যাইতেছিল। বৃষ্টি আরম্ভ হইল বলিয়া—আর দেরি নাই। তাহা হইলেই তো সর্ব্বনাশ! আশঙ্কা-দুর্ব্বল মনে রামতনুর একটা সংশয় উদয় হইল, বউদিদি যদি ভুল বলিয়া থাকেন! কিংবা তাহার পোড়া বরাতে যাহা বেশি সম্ভব—ইহারা যদি বাসা বদলাইয়া ফেলিয়া থাকেন! কিংবা যদি—

বিপন্নভাবে রামতনু এক বৃদ্ধ দোকানীকে বলিল, ওগো কর্ত্তা, আমি বিপ্রদাস লেনে যাব।

বৃদ্ধ কি একটা নেশার ঝোঁকে ঝিমাইতেছিল। মাথা না তুলিয়াই ঘাড়টা একটু হেলাইয়া বলিল, স্বচ্ছন্দে।

বৃষ্টি নামিল। এখানে আর বৃথা কালক্ষেপ করা যায় না। দোকানীকে বিড়বিড় করিয়া কি একটা গালি দিয়া রামতনু এক রকম ছুটিতেই আরম্ভ করিল। বৃষ্টির জলে তাহার উৎসাহ স্যাঁতস্যাঁতে হইয়া আসিতেছিল। স্থির করিল, আর একজনকে জিজ্ঞাসা করিবে; যদি সন্ধান না পায় তো আজ এই পর্য্যন্ত।

এইরূপ মনস্থ করিয়া রামতনু একজন পথিককে প্রশ্ন করিল। সামনেই একটা গলি ছিল, তিনি দেখাইয়া দিয়া বলিলেন, এই গলি দিয়ে একটু বেরিয়ে যান, সামনেই বিপ্রদাস লেন।

রামতনু হাতে স্বর্গ পাইল, কিন্তু মাথার স্বর্গ তাহাকে তীক্ষ্ণ বারিধারায় বিব্রত করিয়া তুলিতেছিল, আর সেই তীক্ষ্ণতা অতিশয়

অসহ্য হইয়া উঠিল, যখন রামতনু বিপ্রদাস লেনে প্রবেশ করিয়া দেখিল, ডাইনে বাড়ির নম্বর ১১১ এবং বামে ১১২।

তাহার মানে, এটা গলির শেষ দিক এবং গলিটাও মস্ত বড়। দুঃখ করিয়া আর কি হইবে? দক্ষিণ দিকের বাড়িগুলার উপর মাঝে মাঝে নজর ফেলিয়া মাথা নীচু করিয়া সে দৌড়াইতে লাগিল। তাই কি ছাই বাড়িগুলাই ছোট? যাহা হউক, এই বড় বড় বাড়িগুলার নম্বর ক্রমে ক্রমে কমিয়া আসিতে লাগিল, এবং রামতনুরও নষ্ট উৎসাহ ফিরিয়া আসিতে লাগিল। অবশেষে একবার মাথা উঁচাইয়া রামতনু দেখিল—২১।

তাহার পরে মুখে হাসি দেখা দিল, এবং সে আর মাথাও নীচু করিল না। চোখে জলের ঝাপটা লাগিতেছিল। আসন্ন সুখের কথা ভাবিয়া এ সামান্য অসুবিধাকে উপেক্ষা করিয়া বাড়ির নম্বরগুলিতে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া রামতনু লম্বা লম্বা পা ফেলিয়া শৌখিন চালে দৌড়াইতে লাগিল। মুখে একটু হাসিও টানিয়া আনিল—যেন ব্যাপারটা সে বড়ই উপভোগ করিতেছে।

ক্রমে ১৮, ১৭, ১৬ নম্বর বাড়ি পার হইয়া গেল। এইবার ১৫, তাহার পর এই ১৪। রামতনু টপ করিয়া উঠিয়া পড়িল। দিব্য বারান্দাওয়ালা বাড়ি।

গলা হইতে চাদরটা নামাইয়া নিংড়াইতে নিংড়াইতে রামতনু বলিল, কি বৃষ্টি! এবং একবার চারিদিকটা চাহিয়া দেখিল।

বারান্দার এক কোণে একটা পশ্চিমা চাকর গুনগুন করিয়া গান করিতেছিল—

"কলকতিয়াকে লোগনিকে নহি পতিয়ইহ
সমঝুহ সমঝুহ সখি বাট ঘাট যেইহ।"

অর্থাৎ, হে সখি, কলিকাতার লোককে প্রত্যয় নাই, অতএব পথঘাট চলিবে খুব সামলাইয়া। সুতরাং এবংবিধ অবিশ্বাস্য একজন কলিকাতাবাসীকে পথঘাট ছাড়িয়া একেবারে তাহার প্রভুর গৃহে আসিয়া উঠিতে দেখিয়া রুক্ষভাবে সে বলিল, এ মাশা, কিনারে চলিয়ে দাঁড়ান; দালানকে মাঝখানে জল পরসে।

রামতনুর এতক্ষণ অন্য রকম অভ্যর্থনা পাইবার কথা। কিন্তু তাহার কোন চিহ্ন না পাইয়া সে দালানের মাঝখানেই দাঁড়াইয়া রহিল। এক্ষণেই পরিচয়মাত্রে তাহার কদর দেখিয়া এ বেটার কিরূপ ভ্যাবা-চাকা লাগিয়া যাইবে, তাহা ভাবিয়া রামতনু বেশ একটু কৌতুক অনুভব করিতেছিল। কিন্তু আর একটু দাঁড়াইয়া চঞ্চলভাবে ইতস্তত দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া দেখিল, দুয়ারে শিকল আঁটা। এতক্ষণ সে শুধু কাঁপিতেছিল, এইবার দাঁতে দাঁত লাগিতে শুরু হইল। কি কুগ্রহ, মিছামিছি সন্ধ্যার সময় এই বৃষ্টিস্নান! আরে, মার ঝাড়ু এই কোর্টশিপের মাথায়! ইহার চেয়ে চার ক্রোশ গরুর গাড়ি চড়িয়া মেয়ে দেখিতে যাওয়া শতগুণে শ্রেয়।

হঠাৎ-পরিচয়ের আশা ছাড়িয়া কাপড় নিংড়াইয়া মাথা মুছিতে মুছিতে রামতনু চাকরটাকে প্রশ্ন করিল, তোর মনিবরা কোথায়?

চাকরটা লোকটার চালচলন দেখিয়া সন্দিগ্ধ মনে ইতস্তত করিয়া বলিল, তাতে তোমার কি জরুরি আছে? এই পাঁচ মিনিটমে এসে পড়বে।—বলিয়া একবার আড়চোখে নির্জ্জন রাস্তা ও রুদ্ধ গৃহগুলার উপর নজর ফিরাইয়া লইল।

বেচারা মনিবের সত্বর প্রত্যাবর্ত্তনের সম্ভাবনা জানাইয়া এই অজ্ঞাতকুলশীল কলিকাতাবাসীটিকে তাড়াইবে ভাবিয়াছিল, কিন্তু ইহাতে তাহাকে বরং প্রফুল্ল হইতে দেখিয়া বেজায় অস্বস্তি অনুভব করিল এবং

রামতনুর উপর হইতে চোখ না সরাইয়া একটু রাস্তার দিকে সরিয়া বসিল।

রামতনু সেটা বিশেষ লক্ষ্য করিল না। নেহাত চুপ করিয়া না থাকিয়া একটু কথাবার্ত্তা কহিবার জন্য বলিল, তুই বুঝি বাবুর চাকর?

উত্তর হইল, হুঁ; লেকিন হামার বড়া ভাই পুলিসে কাম করে। রামতনু বড় ভাইয়ের পরিচয়ের প্রয়োজন তেমন বুঝিতে পারিল না, ভাবিল, ওদের বুদ্ধিই এই রকম।

অনেকক্ষণ নীরবে কাটিল। রামতনু মুঠায় চাপিয়া চাপিয়া জল বাহির করিয়া রকের মাঝেই ফেলিতে লাগিল। চাকরটা অসহিষ্ণুভাবে বলিয়া উঠিল, এ মাশা, কিনারে দাঁড়ান না, কিস মাফিক লোক আপনি?

রামতনু একটু চটিল; ভাবিল, আচ্ছা বেয়াদব তো! কিন্তু মনে হইল, আহা, চেনে না; ও বেচারার আর দোষ কি? তাই এই অজ্ঞানজনিত ঔদ্ধত্যকে ক্ষমা করিয়া বলিল, কই, মনিব যে তোর আসে না?

চাকরটা তাহার দিকে ফিরিলও না, তাচ্ছিল্যের সহিত চুপ করিয়া রহিল। রামতনু ভিতরে ভিতরে জ্বলিয়া যাইতেছিল, কিন্তু ভাবিয়া দেখিল, চটিয়া ফল নাই। তাই কঠোর সংযমের সহিত বলিল, তা যদি দেরিই থাকে তো একটা শুকনো কাপড় নিয়ে আয় দিকিন।

চাকরটা বিজ্ঞভাবে মাথা নাড়িয়া ব্যঙ্গস্বরে বলিল, আর গোরাম গোরাম এক পিয়ালা চা ভি আনিয়ে দি? বোড়ো ভিজিয়ে গেলেন—

রামতনু তখন আরও চটিয়া গেল, কিন্তু আরও নরম সুরে চিবাইয়া চিবাইয়া বলিল, দেখ্, ঢের বাংলা বুলি হয়েছে, চালাকি রাখ্। আমার চাকর হ'লে এতক্ষণ আস্ত থাকতিস নি। তোর মনিব এলে টের পাবি, আমি কে। তবে নেহাত দেরি হ'লে আমি যদি চ'লেই যাই তো, এই কার্ড রইল। নে, একখানা কাপড় নিয়ে আয় দিকিন লক্ষ্মীছেলের মতন।

রামতনু পূর্ব্ব হইতেই কার্ড সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিল। ভিজা একখানা কার্ড বাহির করিয়া তাহার নাম ও ঠিকানা লিখিয়া চাকরটার হাতে দিয়া বলিল, নে, রাখ্; আর এই ঠিকানায় আমার ভিজে কাপড়গুলোও কাল দিয়ে আসবি।

চাকরটা গম্ভীরভাবে কার্ডটা দুই খণ্ড করিয়া ফেলিয়া দিল এবং দাঁড়াইয়া উঠিয়া হুঁশিয়ারির সহিত গলা উঁচাইয়া বলিল, হামার নাম রামটহলবা আসে, হামায় ঠকিয়ে কাপড় লিতে আসে তুম?

রামতনু আর নিজেকে সামলাইতে পারিল না, কারণ মানবের ধৈর্য্য এবং শীত সহ্য করিবার ক্ষমতা—উভয়েরই একটা সীমা আছে। একে তো শুষ্ক কাপড় পাইল না, তাহার উপর চক্ষের সম্মুখে তাহার কার্ডের এই লাঞ্ছনা হওয়াতে সে একেবারে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। ঘুষি বাগাইয়া সামনে আগাইয়া গেল এবং দাঁতে দাঁত পিষিয়া বলিল, আমি ঠগ, জোচ্চোর? বেটা, যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা?

হুঁশিয়ার হইলেই যে সাহসী হইতে হইবে—এমন কোন কথা শাস্ত্রে লেখে না। আবার সম্প্রতি শহরে কয়েকটা ডাকাতি হইয়া গিয়াছিল। রামতনুর উদ্যত ঘুষির নিম্ন হইতে তড়িতের ন্যায় সরিয়া গিয়া মাঝ-রাস্তায় বৃষ্টি মাথায় করিয়া রামটহলবা আর্ত্ত স্বরে ডাকিয়া উঠিল, খুন ভইল, দৌড় হো, ডাকু পড়ল বা—

রামতনু প্রমাদ গণিল। মুহূর্ত্তের মধ্যে নামিয়া পড়িয়া প্রেম ভুলিয়া প্রাণপণে ছুটিল। সামনেই একটা গলি দেখিতে পাইয়া তাহার মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল এবং এ গলি সে গলি করিয়া একেবারে হেদোর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। হাঁপাইতে লাগিল, যেন বুকের পাঁজরা কয়টা ছিটকাইয়া বাহির হইয়া যাইবে।

কিন্তু তখনও তাহার স্বস্তি নাই। সামনে দিয়া মন্থর গতিতে একটা ঘোড়ার গাড়ি যাইতেছিল। একবার চারিদিক চাহিয়া গাড়োয়ানকে সে জিজ্ঞাসা করিল, মেছোবাজার যাবি ?

রামতনুর বস্ত্রের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া গাড়োয়ান বলিল, না বাবু, গদি ভিজে যাবে।

আমি দাঁড়িয়ে যাব বাবা, গদি ভিজলে তুই দাম পাবি।

ডবল ভাড়া লিব বাবু, দেখছেন না, কি রকম বাদল আছে ?

বাদল না হ'লে আর এইটুকুর জন্যে গাড়ি করি ? তা ডবল ডবলই সই, কত হবে ?

দেড় টাকা দিবেন বাবু; আপনি ভদ্রলোক কষ্টে পড়েছেন, কি আর বোলব ?

নিরুপায়ভাবে গাড়িতে চড়িতে চড়িতে রামতনু বলিল, চার আনার ডবল কি দেড় টাকা হয় বাপু ? তা চল্, তোর ধর্ম্ম তোতেই আছে; একটু জোরে হাঁকাস।

গাড়ি চড়িবার মিনিট দুইয়েকের মধ্যে বৃষ্টিটা হঠাৎ ধরিয়া গেল। বিধিরও এই কঠোর বিদ্রূপ দেখিয়া রামতনুর মনে হইল, গাড়ির দেওয়ালে মাথা ঠুকিয়া মরে।

নামিয়া একটা দোকান হইতে পাঁচ গ্রেন কুইনাইন কিনিয়া লইয়া হোটেলে ঢুকিল। তাহার পর ট্রাঙ্ক খুলিয়া গাড়োয়ানের জন্য দেড় টাকা

বাহির করিয়া লইল। তখন কেবল একটি এক টাকার নোট ও বিকশিতদন্ত বিদ্রূপের মত একটি টাকা ট্রাঙ্কের মাঝখানে পড়িয়া রহিল।

৪

পরদিবস বেলা আন্দাজ চারিটার সময় রামতনু বিছানার উপর অলসভাবে শুইয়া জানালার মধ্য দিয়া আকাশ পানে চাহিয়া ছিল। মেঘ ছিল না বলিলেও মিথ্যা বলা হয় না, তবুও ঘরপোড়া গরু যেমন সিঁদুরে মেঘে ডরায়, সেইরূপ যা দুই-এক খণ্ড মেঘ এদিক ওদিক করিয়া বেড়াইতেছিল, তাহা দেখিয়া রামতনুর যথেষ্ট আতঙ্ক উপস্থিত হইয়াছিল এবং আশু বিবাহের আশা দিয়াও তাহাকে শ্যামবাজারে পাঠাইতে পারা যাইত না। সে ভাবিতেছিল, মেঘের নামগন্ধ না মুছিয়া গেলে সে আর পাদমপি নড়িতেছে না। এমন পয়সাও নাই যে, গাড়ি করিয়া যাইবে। আর যাইলেও যে তাহাকে কেন্দ্র করিয়া মস্ত বড় একটা ভিড় দাঁড়াইয়া যাইবে না, তাহারই বা নিশ্চয়তা কি? বেটা উজবুক চাকরটা সব কাঁচাইয়া দিল।

মেসে একটা লোক খবরের কাগজ দিত, সে দেখা দিল। তাহাকে নিজের ঘরে ডাকিয়া রামতনু কাগজটা লইল। হাতে কোন কাজ নাই, একটা কাগজের দামও বেশি নয়, রামতনু জিজ্ঞাসা করিল, কোনও বাংলা কাগজ রাখিস?

লোকটা সোৎসাহে একখানা 'নায়ক' বাহির করিয়া বলিল, এই নিন বাবু, এ রকম গালাগাল পাঁচকড়িবাবু অনেক দিন দেন নি; প্রাণ খুলে লাট সাহেবকে নিয়েছেন একচোট।

রামতনু হাসিয়া কাগজখানা লইল, তাহাকে দাম চুকাইয়া দিল এবং বুকে বালিশটা চাপিয়া কাগজটা বিছানায় মেলিয়া পড়িতে লাগিল।

পড়িবে কি ? প্রথমেই বড় বড় অক্ষরে ছাপা হেডিংগুলায় নজর পড়ায় তাহার আক্কেল গুম হইয়া গেল—"দিনে ডাকাতি ! মাঝ শহরে ভীষণ কাণ্ড !!" নিম্নবর্ত্তী দুইটি অনতিক্ষুদ্র প্যারাগ্রাফে লেখা আছে—"গতকল্য বেলা আন্দাজ ৪॥০ ঘটিকার সময় ১৪নং বিপ্রদাস লেনে শ্রীযুক্ত বাবু সারদাপ্রসাদ দত্তের ভবনে একটি লোমহর্ষণ ডাকাতির উপক্রম হইয়া গিয়াছে। মুষলধারায় অশ্রান্ত বৃষ্টি হইতেছিল বলিয়া গলিতে লোক-চলাচল বন্ধ ছিল এবং আশপাশের বাড়িগুলিরও দুয়ার-জানালা প্রায় সব রুদ্ধ ছিল। সারদাবাবু সপরিবারে ৺কালীঘাটে দেবীদর্শনে গিয়াছিলেন। বাড়িতে ছিল মাত্র একটি পশ্চিমা চাকর। এই সময় সুযোগ বুঝিয়া একটি ভদ্রবেশধারী যুবা ভিজিতে ভিজিতে আসিয়া বারান্দায় উঠে এবং প্রথমে সোজা কথায় একখানি শুষ্ক বস্ত্র চাহিয়া আলাপ জমাইবার চেষ্টা করে এবং তাহাতেও কৃতকার্য্য না হইয়া একখানি কার্ড হাতে দিয়া বলে যে, সে তাহার প্রভুর আত্মীয়। চাকরটা ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া কার্ডটা ছিঁড়িয়া ফেলে এবং তাহাকে অর্দ্ধচন্দ্রদানে নিষ্ক্রান্ত করিবার প্রয়াস করে। ইহাতে দুর্ব্বৃত্ত জামার মধ্য হইতে একখানা ভোজালি বাহির করিয়া তাহাকে আক্রমণ করে। তখন ভৃত্যটা রাস্তায় পড়িয়া চীৎকার করিয়া লোক জড় করে। ইত্যবসরে ভদ্রবেশধারী গুণ্ডাটি চম্পট দেয় ; এবং ঠিক এই সময় গলির বাহিরে সদর-রাস্তা দিয়া একটি মোটরকে উর্দ্ধশ্বাসে বৃষ্টির মধ্য দিয়া ছুটিয়া যাইতে দেখা যায়। পুলিসের তদন্ত চলিতেছে।

"দ্বিখণ্ডিত কার্ডের অর্দ্ধেকটা মাত্র পাওয়া গিয়াছে ; সেটার লেখাটুকুও নাকি জল পড়িয়া এমনই অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে যে, কিছুই নিরূপিত হয় না। আমাদের লালপাগড়ী ভায়ারা বোধ করি ভাবিতেছেন, লেখাটা

পড়া গেলে ব্যাপারটার একটা কিনারা হয়। এমন না হইলে আর বুদ্ধি! আমরা বলি, অত মাথা না ঘামাইয়া, বিজ্ঞাপন দিয়া ঠিকানাটা ডাকাতের নিকট হইতে আনাইয়াই লওয়া হউক না।"

রামতনুর সর্ব্বাঙ্গে কাঁটা দিয়া উঠিল। কি সর্ব্বনাশ! সে একজন ফেরারী আসামী! তাহাকে লইয়া শহরময় হৈ-চৈ পড়িয়া গিয়াছে! ঘামে তাহার বুকের বালিশ ভিজিয়া গেল এবং তাহার মনে হইতে লাগিল, যেন মাথার মধ্যে একটা গুবরে-পোকা ঢুকিয়া ভোঁ-ভোঁ করিয়া চক্র দিতেছে। ক্রমে পারিপার্শ্বিক জিনিসগুলার ধারণা যেন তাহার এলোমেলো হইয়া আসিতে লাগিল।

মিনিট পাঁচেক পরে সে অতিকষ্টে নিজেকে একটু সামলাইয়া লইল; বাহিরে গিয়া বেশ করিয়া মাথাটা ধুইয়া ফেলিল। লোকটা সাধারণত দেবদেবী মানিত না, কিন্তু হঠাৎ তাহার তেত্রিশ কোটির উপরই দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়া গেল, এবং যাঁহারা বিশিষ্ট, তাঁহাদের মধ্যে যিনি যাহা পছন্দ করেন, তাঁহার জন্য সেই দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে মানত করিয়া বসিল। আবার ভিতরে আসিয়া কাগজটা আর একবার পড়িয়া তাড়াতাড়ি ভাঁজ করিয়া ফেলিল। তাহাতেও তাহার মন যেন মানিল না। খবরটা শহরের অনেকে পড়িয়াছে এবং পড়িতেছে, কিন্তু তাহার ভীতি এই কাগজখানিতে এমন সংবদ্ধ হইয়া পড়িল যে, সে যেন ইহা লোকচক্ষুর অন্তরালে রাখিলেই বাঁচে। তাহার ঘরে এই খবরটা তাহার কেনা এই কাগজে কেহ পড়িলে যেন তাহার গ্রেপ্তার না হইয়াই যায় না।

রামতনু এদিক ওদিক দেখিয়া ভাঁজ-করা কাগজখানা বিছানার নীচে একেবারে মাঝখানে গুঁজিয়া দিল। জানালা দিয়া কাগজখানা রাস্তায় ফেলিয়া দেওয়াও তাহার নিরাপদ বোধ হইল না।

তাহার পর মাথায় হাত দিয়া ভাবিতে লাগিল, এখন পুলিসের হাত হইতে বাঁচিবার উপায় কি? মাতৃবাক্য ঠেলিয়া একেবারে অশ্লেষা-মঘা মাথায় করিয়া আসিয়া কি অঘটনটাই না ঘটিল! যাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া আসা, তাহার মুখ তো এখনও দেখাও গেল না; যদি ভবিষ্যতে দেখা হয় তো পুলিসপরিবৃত হইয়া—কল্পনাতেও প্রেমের নেশা ছুটিয়া গায়ে কাঁটা দিয়া উঠে। সে মুখ দেখাইবার বদলে এখন ভগবান যদি তাহার নিজের মুখ লুকাইবার একটু সুযোগ করিয়া দেন তো সে হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচে। ধর, শেষ পর্য্যন্ত জেলে না হয় নাই যাইতে হইল, কিন্তু এই কুটুম্ব-সাক্ষাৎ লইয়া কি কেলেঙ্কারিই না হইবে! শেষে বাড়ি পর্য্যন্ত টান ধরিবে, তাহার প্রবঞ্চনা করিয়া চলিয়া আসার কথাও জাহির হইয়া পড়িবে এবং সে আসার উদ্দেশ্যও কাহারও অবিদিত থাকিবে না। হা ঈশ্বর, স্বপ্নে দেখাইয়াছিলে মধুর মিলন, আর বাস্তবে দাঁড় করাইলে কাঠগড়ায় দাঁড়াইয়া ডাকাতির দায়ের এজাহার! তবে আর ভক্ত-বৎসল তোমায় বলে কেন মিছামিছি?

নীচে ঠাকুরের সঙ্গে যেন একটি ভদ্রলোকের কথাবার্ত্তার আওয়াজ শোনা গেল; তাহার পর সিঁড়িতে পায়ের শব্দ—রামতনু উৎকর্ণ হইয়া রহিল। শব্দটা যেন তাহারই ঘরের দিকে আসিতেছে; বিবশাঙ্গ রামতনু দরজার দিকে অপলক নেত্রে চাহিয়া রহিল।

ভদ্রলোকটি দরজার সামনে আসিয়া রামতনুকে নমস্কার করিলেন, তাহার পর ভিতরে প্রবেশ করিয়া বিনাবাক্যব্যয়ে চেয়ারখানায় বসিয়া বলিলেন, মশায়—

রামতনু ঠিক এতক্ষণে সাহস সঞ্চয় করিয়া বলিল, মশায়—

দুইজনের কথা একসঙ্গে বাহির হওয়ায় দুইজনেই একটু থতমত খাইয়া গেল। সামলাইয়া রামতনু কি বলিতে যাইতেছিল, তাহার

আগেই ভদ্রলোকটি বলিলেন, এখানে রাম—এই রাম—অর্থাৎ রাম-তারণ ব'লে কেউ থাকেন ?

রামতনু বুঝিল, এ সাক্ষাৎ ডিটেক্‌টিভ, আর রক্ষা নাই। ঢোক গিলিয়া জড়িত স্বরে বলিল, আজ্ঞে, কই, না।

থাকেন না ? তাই তো—আচ্ছা, ধরুন, রামের সঙ্গে কিছু যোগ ক'রে—যেমন ধরুন—রাম—রাম—

রামতনুর বক্ষে সজোরে ঢিপঢিপ করিয়া আওয়াজ হইতেছিল। সে ব্যস্তভাবে বলিল, না না মশায়, ও রকম ধরনের নাম—রামায়ণ থেকে কোন নামই এ বাড়িতে নেই। আপনি বোধ হয় ভুল ঠিকানায় এসেছেন।

লোকটি রামতনুর দিকে একটু অপ্রতিভভাবে চাহিলেন ও বলিলেন, মশায়, মাফ করবেন, আপনাকে বোধ হয় বিরক্ত করছি ; আপনি অসুস্থও বোধ হচ্ছে, কিন্তু একটু হাঙ্গামায় পড়া গেছে।—বলিয়া পকেটে হাত দিলেন এবং কোণাকোণি ছিন্ন একটা কার্ড বাহির করিয়া পড়িয়া বলিলেন, আজ্ঞে না, ঠিকানা ঠিক এই, এই দেখুন না।

রামতনু কার্ড দেখিবে কি, সব আঁধার দেখিতেছিল। এ সেই তাহারই কার্ড—রামটহলের হাতে ছেঁড়া। সে মন্ত্রমুগ্ধের মত কার্ডটার দিকে চাহিয়া রহিল, তাহার আর বাক্যস্ফূর্তি হইল না।

হঠাৎ লোকটি বলিলেন, আচ্ছা, আপনি এখানে আছেন কদিন ? সবাইকে চেনেন ?

রামতনুর নেশার মত ভাবটা ছাঁত করিয়া কাটিয়া গেল ; সে মুখ তুলিয়া পাগলের মত ফ্যালফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল।

লোকটিও ব্যাপারটা আন্দাজ করিতে পারিলেন না। নিজেকে সামলাইয়া লইয়া বলিলেন, না, আপনি রেস্ট নিন, আপনাকে জ্বালাতন

ক'রে বড় অন্যায় করছি। আমি বোধ হয় ভুল ঘরেই ঢুকেছি; কিন্তু অন্য ঘরগুলোও বন্ধ। তা আমি এই বইটা নিয়ে বসি। অন্যান্য ভদ্রলোকেরা এলে খোঁজ নোব। তাহার পর তিনি চিন্তিতভাবে নিজের মনে মনেই বলিলেন, কিংবা হতেও পারে, নিজেই বোধ হয় ভুল বুঝেছি।—বলিয়া বইখানার পাতা উল্টাইতে লাগিলেন।

বলে কি? বসিয়া থাকিবে! রামতনুর মাথায় বাজ পড়িল। বিপদে বুদ্ধিবৃত্তিকে একটু গুছাইয়া লইয়া বলিল, আজ্ঞে, ব'সে থেকে তো কোন ফল নেই; আমি এ মেসের সব্বাইকেই জানি। আজ চার বছর একটানা এখানে রয়েছি। আপনি মিছিমিছি সময় নষ্ট করছেন।

ভদ্রলোক উত্তর দিলেন না, শুধু চক্ষু কুঞ্চিত করিয়া বইয়ের এক জায়গায় কি যেন পড়িবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাহার পর সন্দিগ্ধভাবে রামতনুর মুখের দিকে খানিকক্ষণ চাহিয়া হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন, তা থাকুন মশায়, চার বছর, কিন্তু দু মিনিটে আমি যা টের পেয়েছি, আপনি চার বছরে কেন টের পান নি, তা জানি না। অর্থাৎ রামতনু ব'লে এখানে কেউ আছেন, সম্ভবত এই মেসেই থাকেন, আর সম্ভবত আমার সামনেই ব'সে আছেন। দেখুন তো, এই বইখানা বোধ হয় আপনার।—বলিয়া রামতনুর যেখানে নামটা লেখা ছিল, সেইখানটা টিপিয়া ধরিয়া তাহার সম্মুখে বইটা বাড়াইয়া ধরিলেন।

রামতনুর মুখটা ছাইয়ের মত ফ্যাকাশে হইয়া গেল। লোকটির হাতটা চাপিয়া ধরিয়া নিতান্ত মিনতির স্বরে কহিল, মশায়, বাঁচান, কিছু দোষ নেই আমার, জেল থেকে—

কিছু দোষ নেই, নিতান্ত বলা যায় না; কারণ মিছিমিছি আত্ম-গোপন করতে গিয়ে আমায় যা ভাবিয়েছেন, তাতে একটু দোষ হয়েছে

বইকি। তবে তার জন্যে জেলে যেতে হবে না, এ গ্যারান্টি আমি দিতে পারি। তারপরে, ব্যাপারটা একটু খুলে বলুন তো।

রামতনু ব্যাপারটা খুলিয়া বলিল না বটে, তবে কিছু কিছু বলিল; অর্থাৎ, সারদাবাবুর সহিত তাহাদের কুটুম্বিতা কি প্রকারের আর সেই কুটুম্বিতাসূত্রে আলাপ করিবার প্রয়াসে ব্যাপারটা কিরূপ অহেতুকভাবে ঘোরালো হইয়া দাঁড়াইয়াছে—ইত্যাদি, ইত্যাদি। বেশির ভাগ গোপনই করিল—যেমন আসিবার মুখ্য উদ্দেশ্য কি, আসিল কত বাধা-বিপত্তির মাঝে, আরও অনেক কথা।

ভদ্রলোকটির নাম অমিয়বাবু। তিনি বলিলেন, হ্যাঁ, আমিও অনেকটা এই ধরনের কিছু একটা হবে তা আন্দাজ করেছিলাম। চাকরটা যখন একটা কার্ডের টুকরো দেখিয়ে বললে, আবার আমায় কার্ড দিয়ে ভোলাতে এসেছিল, তখনই আমার মনে একটু খটকা লাগে; ভাবলুম, বাংলা দেশে ডাকাতির যুগটা এখনও সম্পূর্ণ যায় নি বটে, তবে চিঠিপত্র দিয়ে ডাকাতির যুগটা আর নেই। লুট করতে এসে ঠিকানা রেখে যাবে, এমন ডাকাতকে অতি-সাহসী অথবা অতি-বোকা বলতে হবে, তা এই সভ্যযুগে এই দু রকমের কোনটাই থাকা সম্ভব নয়।

পুলিসরা কার্ডের খানিকটা পেয়ে বাকিটা খুঁজতে লাগল। দৈবক্রমে সেটা জলকাদা মাখা হয়ে আমার জুতোর পাশেই প'ড়ে ছিল; আমি জুতোর তলায় সেটা চেপে ধরলাম, এবং সুবিধেমত উঠিয়ে পকেটে পুরলাম। কার্ডের এই আধখানা নিয়ে আমি দুটো সিদ্ধান্ত খাড়া করলাম—প্রথমত, যদি খারাপ মতলবে কেউ এসে থাকে তো এটার কোন মূল্যই নেই; সে প্রকৃতপক্ষেই চাকরটার কাছে নিজের আত্মীয়তা প্রমাণ করতে গিয়েছিল একটা যা-তা ঠিকানা দিয়ে। আর যদি কোন জানিত লোক দেখা করতে এসে থাকে, তবে এটার যথেষ্টই দাম আছে।

আমার নিজের আন্দাজ কাউকেও আর জানালাম না, ভাবলাম, একবার চুপিচুপি দেখা যাবে।

ঠিকানাটা বুঝতে ততটা বেগ পেতে হয় নি ; তবে নামটা সমস্ত পাওয়া গেল না। এই দেখুন না, আন্দাজে 'রাম'-গোছের একটা কথা দাঁড় করানো যায়, বাস্, তার পরে ছেঁড়া। পুলিসের হাতে যেটুকু আছে, তাতে নামের যেটুকু ছিল—একেবারে জলকাদায় মুছে গেছে, নীচে খালি 'লেন' আর তার নীচে 'ক্যাল্‌কাটা' পড়া যায়।

কিন্তু পুরো নামের অভাবটুকুই ব্যাপারটাকে খানিকটা রহস্য দিয়ে একটু জমাট ক'রে তোলে, আর আমার একটু ডিটেক্‌টিভি করার লোভটা বাড়িয়ে দেয়। এটুকু না থাকলে তো ব্যাপারটা এক রকম বৈচিত্র্যহীনই বলতে হয়।

যা হোক, শেষে কিন্তু আপনি বড় দমিয়ে দিয়েছিলেন। আর আপনার এই বইখানি আমায় সাহায্য না করলে আমায় বড় অপ্রস্তত হয়ে বাসায় ফিরতে হ'ত। আচ্ছা, আপনি কিন্তু এতটা বেগ দিলেন কেন? সত্যিই ডাকাতি করতে গিয়েছিলেন নাকি? তা হ'লে গেরস্থের কাছে ঠিকানা দিয়ে আসতে পারলেন, আর আমার কাছে আত্মপরিচয় দেবার সময় সব সাহস লোপ পেল?

ভদ্রলোকটি চেয়ারে হেলান দিয়া খুব হাসিতে লাগিলেন ; রামতনু ক্ষীণভাবে তাহাতে একটু যোগ দিল। তাহার পর বিছানার ভিতর হইতে 'নায়ক'খানা বাহির করিয়া বলিল, পড়ুন এইখানটা, তা হ'লেই শ্রাদ্ধ কতদূর গড়িয়েছে বুঝতে পারবেন। মশায়, মানুষ সাধু কি অসাধু, তা আর আজকাল তার নিজের কাজের ওপর নির্ভর করে না, নির্ভর করে এই সব খবরের কাগজগুলোর মতামতের ওপর।

অমিয়বাবু উচ্চহাস্যে মধ্যে মধ্যে বিবরণটুকু পড়িয়া কাগজটা রাখিয়া

দিলেন, বলিলেন, বাহাদুরি তবে আমারই বেশি, একটা মস্তবড় ব্যাপারের কিনারা ক'রে ফেলেছি। কিন্তু আসল কথাটা যে চাপা প'ড়ে যাচ্ছে। নিন জামা-টামা প'রে, ব্যাপারটা না জুড়তে পরিচয় হ'লেই ভাল, তাঁদের একেবারে অভিভূত ক'রে ফেলা যাবে। নিন, আমি ততক্ষণ একটা সিগারেট ধরাই।

ভয়টা যখন সম্পূর্ণ তিরোহিত হইল, রামতনুর মনে আবার পূর্ব্বের ভাবটা আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া লইল। অমিয়বাবু তাহাকে বিপন্মুক্ত করিয়াছেন বটে, কিন্তু বিশেষ করিয়া তিনি তাহার বাঞ্ছিতার আত্মীয় বলিয়া সে সহজেই তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িল এবং তাঁহার আতিথ্যের জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিল। অমিয়বাবু যখন সিগারেট ধরাইতেছিলেন, রামতনু প্রচ্ছন্নভাবে একটা টাকা বাহির করিয়া নীচে নামিয়া গেল এবং ঠাকুরকে বাছা বাছা খাবার, এক বাক্স কাঁচিমার্কা সিগারেট ও পানের ফরমাশ দিয়া উপরে উঠিয়া আসিল। তাহার মনে হইতেছিল, হ্যাঁ, শেষ পর্য্যন্ত বিয়ের ফুলটা ফুটল তা হ'লে, ভগবান মুখ তুলে চাইলেন,—ওঃ, চাইতেই হবে, অধ্যবসায় ব'লে একটা জিনিস আছে তো। আর তিনিই শুধু আছেন, ওসব দেবতা-টেবতা কিছু নয়।

ঘরে আসিয়া প্রফুল্লভাবে অমিয়বাবুকে বলিল, তা নয় টাটকা-টাটকিই দেখাশোনা করা গেল; কিন্তু আগে থাকতে বাড়িতে কে কে আছেন জানা থাকলে পরিচয়ের বিশেষ সুবিধে হয়। অর্থাৎ নতুন পরিচয়ের আড়ষ্ট ভাবটা অনেকটা কেটে যায়। বিশেষ ক'রে আপনাকে ভাগ্যক্রমে পেয়ে আমি এ সুযোগটুকু ছাড়তে রাজি নই।

রামতনু পূর্ব্বে অবশ্য অনেকটা শুনিয়াছিল, কিন্তু যাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া আসা, তাহার সম্বন্ধে আলোচনার জন্য তাহার তৃষিত মনটা বড়ই ব্যগ্র হইয়া উঠিল—বিশেষ করিয়া তাহারই এই আত্মীয়ের সহিত।

অমিয়বাবু বলিলেন, হ্যাঁ, সে কথা মন্দ কি! তবে মেলা লোকের মধ্যে গিয়ে আপনাকে হাঁপিয়ে পড়তে হবে না—বাড়িতে ওঁদের আছেন মাত্র কর্ত্তা স্বয়ং, আর এই গিয়ে একটি মেয়ে, মা আর একটি ছেলে, সে নেহাত ছেলেমানুষ—ইস্কুলের নীচু ক্লাসে পড়ে।

নিজের অন্তর্নির্দ্দিষ্ট পথে আলোচনাটিকে লইয়া যাইবার জন্য রামতনু বলিল, হ্যাঁ, লেখাপড়ার কথায় মনে প'ড়ে গেল, সারদাবাবুর মেয়েটি তো খুব উচ্চশিক্ষিতা?

উচ্চশিক্ষিতা এখনও বলা যায় না, ম্যাট্রিকটা পাস করেছেন মাত্র; তবে হ্যাঁ, আরও পড়েন সবারই এই রকম ইচ্ছে।—কথাগুলা অমিয়বাবু ঘাড়টা একটু নামাইয়া মৃদু হাসিয়া বলিলেন।

রামতনু বলিল, যাই হোক, আমাদের মধ্যে এটুকুও বড় একটা পাওয়া যায় না, আলাপ ক'রে তৃপ্তি পাওয়া যাবে। তার ওপর আপনার সঙ্গে পরিচয়টা আগে থাকতেই হয়ে রইল। আপনার সঙ্গে ওঁদের খুব ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ব'লে বোধ হচ্ছে যেন।

অমিয়বাবু পূর্ব্ববৎ হাসিয়া বলিলেন, সম্বন্ধ কিছুই ছিল না, তবে কয়েক দিন থেকে হয়ে দাঁড়িয়েছে বটে, আর সেটা একটু ঘনিষ্ঠও বলতে হবে বইকি।

রামতনু বিশেষ কিছু না বুঝিয়া, শুধু বাক্যের কৌশলটুকু লক্ষ্য করিয়া হাসিয়া বলিল, কি রকম?

অর্থাৎ—ওর নাম কি—ওঁর সেই মেয়ের সঙ্গে সম্প্রতি আমার বিবাহ হয়েছে।—বলিয়া পূর্ব্বের মত লজ্জিতভাবে হাসিতে হাসিতে অমিয়বাবু নির্ব্বাপিত সিগারেটটা আবার ধরাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন; এবং ঠিক এই সময়ে দরজার আড়াল হইতে উড়ে ঠাকুরটা বিজ্ঞের মত মুচকি হাসিয়া ইশারা করিয়া জানাইল, আতিথ্যের আয়োজন সব হাজির।

অকাল-বোধন

১

বিবাহের পরে ননদ প্রথম বার শ্বশুর-বাড়ি যাইবে, নন্দাই লইতে আসিয়াছে ; পঙ্কজিনীকে তাহার নিজের ঘরটি কিছুদিনের জন্য এই নব-দম্পতিকে ছাড়িয়া দিতে হইল, কারণ বাড়িতে ঘরের অভাব। কর্ত্তার বন্দোবস্ত হইল সদর-ঘরে। ছোট যে ভাঁড়ারঘরটি ছিল, তাহারই জিনিসপত্র সরাইয়া পঙ্কজিনী নিজের, পুত্রকন্যাদের এবং দেবরটির সংস্থান করিয়া লইল।

কোলের ছেলেটি এই পরিবর্ত্তনের কারণ বুঝিতে না পারিয়া মার গলা জড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, আমাদেল ঘলে ছুলে না কেন মা ?

তোর পিসী তাড়িয়ে দিয়েছে।

বাবাকেও তালিয়ে দিয়েতে ?

হ্যাঁ, দিয়েছে বইকি।

কেন ?

আড়ি পাতিবার সময় উতরাইয়া যাইতেছিল। ছেলের কানের উপর ঘুমপাড়ানির লঘু আঘাত করিয়া জননী বলিল, নে, ঘুমো দিকিন তুই এখন, বকর-বকর করতে হবে না,—ওই, আয় তো রে হুমো—

সমস্ত দিনের দৌরাত্ম্য-ক্লান্ত শিশু অমন পিসীমার স্বভাবের এই আকস্মিক পরিবর্ত্তনের কথা, হুমোর অলৌকিক চেহারা এবং কীর্ত্তি-কলাপের কথা এবং দিবসের হাসিকান্নার দুই-একটা আধবিস্মৃত কথা ভাবিতে ভাবিতে মায়ের কোলে নিদ্রায় এলাইয়া পড়িল। একটু

পরেই পাড়ার কয়েকজন যুবতীর চুড়ির ঠুনঠুন, কাপড়ের খসখসানি এবং চাপা গলার ফিসফিসানিতে ঘরের পাশের হাওয়াটা কৌতুক-চঞ্চলতায় জীবন্ত হইয়া উঠিল। পঙ্কজিনী কোলের ছেলেটিকে আরও দুই-একটা নরম আঘাত দিয়া শোয়াইয়া দিল; ঘরের অন্যান্য ঘুমন্ত মুখগুলির উপর চক্ষু বুলাইয়া লইল; তাহার পর চাপা স্বরে অনিচ্ছার আভাস মিশাইয়া বলিল, জুটেছিস পোড়ারমুখীরা? বলিহারি শখ তোদের, কোথায় একটু চোখ বুজব, না—। বলিতে বলিতে খিড়কির দরজাটার অর্গল খুলিয়া দিল।

একজন ভিতরে আসিতে আসিতে নথের ঝাঁকি দিয়া বলিল, নাঃ, শখে আর কাজ কি? তোমার কত্তার কাছে গিয়ে ভাগবতে দীক্ষা নিগে যাই। বলি, হ্যাঁ, তাঁকে বাড়ির বাইরে করেছ তো? নইলে আমাদের মতলব টের পেলে এই রাত-দুপুরে ডাকাত-পড়া কাণ্ড ক'রে তুলবেন 'খন।

এই সম্মিলনীটিতে বয়সে বোধ হয় পঙ্কজিনীই সবচেয়ে বড়, তাই সে সলজ্জ গাম্ভীর্য্যের সহিত বলিল, দেখিস, বেশি বাড়াবাড়ি করিস নি কিন্তু সব। এই দেড় দিন গাড়িতে এসে হাক্লান্ত হয়ে আছে বেচারা, একটু ঘুমনো দরকার।

এই সহানুভূতিতে একটি তরুণী নরম পর্দ্দাতেই খিলখিল করিয়া হাসিয়া ফেলিল, অপরের গা ঠেলিয়া বলিল, দিদি ভুলে গেছে সব; ঘুমের জন্যেই ওদের মাথা-ব্যথা বটে। ইহাতে দলটির একপাশে কয়েকজনার মধ্যে একটু টেপা হাসি, অর্থপূর্ণ চাহনি এবং দুই-একটা অন্যবিধ বয়সসুলভ ইশারার বিনিময় হইয়া গেল। যাহারা এই চপলতা-টুকুর মূল কোথায় বুঝিল না, তাহারা কপট বিরক্তির সহিত মত দিল, এসব ছ্যাবলাদের সঙ্গে কোথাও যাইতে নাই।

অমনই ছ্যাবলাদের দলের একজন হঠাৎ ভারিক্কি হইয়া বলিল, তাই না তাই, দু চক্ষের বালাই সব—

এই ছলাটুকুতে সকলে হাসিয়া উঠিল। পঙ্কজ ঠোঁটে হাসির একটু রেশ টানিয়া রাখিয়া বলিল, পোড়ার মু—খ, রঙ্গ নিয়েই আছেন।

ইহারা যতই আনন্দমুখর হইয়া উঠিতেছিল, পঙ্কজিনীর উৎসাহটা যেন ততই শিথিল হইয়া আসিতেছিল। ইহারা সকলে মিলিয়া হঠাৎ ঘরটার মধ্যে পূর্ণযৌবনের এমন একটা রসহিল্লোল তুলিল যে, যৌবন-সীমাগতা এই নারীর ইহাদের মধ্যে নিজেকে নিতান্ত খাপছাড়া বলিয়া বোধ হইল। যদি চিন্তার ক্ষমতা থাকিত, তাহা হইলে স্ফুটমান কলিটির পাশে যে ফুলটি ফোটা শেষ করিয়া দুই-একটি দল হারাইয়া বৃন্তসংলগ্ন রহিয়াছে, সেও বোধ করি এক রকমই ভাবিত। একেবারে তাহার সমবয়সীগোছের কেহই ছিল না সেখানে, তাহার পাতানো 'গোলাপ' পর্য্যন্ত নয়। কেন যে ছিল না, পঙ্কজ তাহার কারণ নিজের মনকে নিজেই দিল—তাহারা সব নিজেদের সাত আট দশ বৎসরের পুত্রকন্যা লইয়াই ব্যস্ত, এই সব লঘুতার কি আর অবসর আছে? একজনকে প্রশ্ন করিল, কই, গোলাপ এল না রে ছোট বউ? উত্তর পাইল, তাঁর শরীরটা তেমন ভাল নয়।

সেই মুখরা মেয়েটা একটু পিছনে সরিয়া গিয়া একজনের ঘাড়ে মুখ গুঁজিয়া বলিল, মোটে দুদিনের ছুটিতে গোলাপের 'ভোমরা' বাড়ি এসেছে।

কে তাহার গাল দুইটা টিপিয়া ধরিল, বলিল, মুয়ে আগুন, রস যে ধরে না আর! তোমার ভোমরারও শিগগির আসা দরকার হয়ে পড়েছে।

পঙ্কজিনী হঠাৎ বলিল, তা সব দাঁড়িয়ে রইলি যে? যা করতে এসেছিস কর্‌গে।

একজন বলিল, বাঃ, আর তুমি ?

নাঃ, আমি আর না ; তোদের সব দোর খুলে দিতে উঠেছিলুম।

সে গেলই না। বিছানায় গিয়া শুইল এবং উঠানের ওপার হইতে যখন মাঝে মাঝে ত্রস্ত মলের শিঞ্জিনী এবং রুদ্ধ হাসির তরল ঝঙ্কার ভাসিয়া আসিতে লাগিল, সে খোকার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে কি ভাবিয়া শরমে সঙ্কুচিত হইয়া উঠিতে লাগিল।

২

বাড়িটা কয়েক দিন ধরিয়া পাড়ার কৌতুক-রহস্যের কেন্দ্র হইয়া রহিল। রাত্রে যুবতীদের রঙ্গরস, সকালে ছোট মেয়েদের দৌরাত্ম্য, এবং মধ্যাহ্নে গুলের-কৌটা-হাতে ঠানদিদিদের তামাক-গুঁড়ার মতই ঝাঁঝালো রসিকতা—এসবের মধ্যে পঙ্কজিনীকে সহায়িকা হইয়া থাকিতে হইত। ফলে, প্রথম প্রথম তাহার এই নবদম্পতির উপর যে স্বাভাবিক করুণার ভাবটি ছিল, তাহাও তিরোহিত হইয়া ইহাদিগকে বিদ্রূপলাঞ্ছিত করিবার ইচ্ছাটা প্রবল হইয়া উঠিতে লাগিল। তাই সকালবেলা স্বামীর পূজার জন্য চন্দন ঘষিবার সময় সে দুষ্টামির হাসি হাসিতে হাসিতে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের উপদ্রবের নব নব প্রণালীতে তালিম দিতে লাগিল; রাত্রে আড়ি পাতিবার সুবিধার জন্য দুয়ার জানালা যাহাতে বাহির হইতে খোলা যায়, তাহার উপায় করিয়া রাখিতে লাগিল ; এবং মধ্যাহ্নে প্রবীণারা যখন নূতন বরটিকে ঘিরিয়া আসর জমাইয়া বসিত, তখন সেও পাশ হইতে ফোড়ন দিতে লাগিল, ঠাকুর-জামাইয়ের আজকাল ওই রকমই গোলমাল হচ্ছে। নিজে পান খান না, অথচ সকালে ঠোঁটের ওপর রাঙা ছোপ লেগে থাকে ; আর

বিছানা থেকে উঠলে মুখে নয় একটু সিঁদুরের দাগ, নয় কোনখানে সোনার আঁচড়, সে তো রয়েছেই—

ইহার উপর কেহ বোধ হয় তাহাকেই খোঁচা দিয়া বলিত, মর্, তোর কথার ভাবে বোধ হয়, সারা সকালটা নাতজামাইয়ের চাঁদমুখটির দিকেই হাঁ ক'রে চেয়ে ব'সে থাকিস।

সে উত্তর দিত, তা একটু থাকি বইকি। জানি, দুপুরবেলা দশটি রাহুতে মুখটি নিয়ে কাড়াকাড়ি লাগাবে যে।

এই রকমই হইতে লাগল। মোট কথা, শান পড়িলে অস্ত্রখানিকে লইয়া কেবল যেমন চোপ বসাইতে ইচ্ছা করে, ক্রমাগত চর্চ্চার ফলে পঙ্কজের রহস্য-বিদ্রূপের প্রয়োগ সম্বন্ধে সেই রকম একটা প্রবল ইচ্ছা দাঁড়াইয়া গেল। মাঝে পড়িয়া নাকাল হইতে লাগিল এই লাজুক বরটি।

মনটা পঙ্কজের তারল্যে ছলছল করিতে লাগিল। সে, নেহাত কোলে-পিঠে করিয়া মানুষ-করা বলিয়া ননদের সহিত ঠাট্টা করিত না, কিন্তু আজকাল তাহার বিদ্রূপের দুই-একটা ঝাপটা সে বেচারীকেও বিব্রত করিতে লাগিল।

হঠাৎ যেন নিজের বয়সের ভার ছাড়িয়া পঙ্কজিনী খানিকটা হাল্কা হইয়া পড়িল।

কিন্তু স্বামী তাহার মাঝে মাঝে রসভঙ্গ করিয়া দিত। জমাট মজলিসের মধ্য হইতে তাহাকে ডাকিয়া লইয়া কখনও বলিত, নাও নাও, ঢের হয়েছে, আমার 'বেদান্তদর্পণে'র পাতাটা যে খুঁজতে বলেছিলুম, মনে আছে?

পাতাটা চার মাস যাবৎ নিরুদ্দেশ। পঙ্কজিনী বোধ হয় বলিয়া ফেলিত, কথাটা ঠিকই মনে আছে, কিন্তু পাতাটা বাড়িতে নেই।

স্বামী গম্ভীরভাবে বলিত, আমি জানি, এই বাড়িতেই আছে ; তার হাত-পা গজায় নি যে—

কিন্তু হাত-পা আছে এমন ছেলেপিলে তো ফেলে দিয়ে আসতে পারে ?

যেখানে মেয়েমানুষ এমন লঘুচিত্ত, সে বাড়িতে ছেলেপিলেরা সবই করতে পারে। আমি বলি, রঙ্গরস ছেড়ে একটু খুঁজলে ভাল করতে ; যত সব—

একদিন মধ্যাহ্ন-বৈঠক হইতে পঙ্কজের জরুরি তলব হইল। ব্যাপার কি ?—বলিয়া সে একটু বিরক্তভাবেই স্বামীর সামনে আসিয়া দাঁড়াইল এবং বলিল, তোমার কি একটু আক্কেল নেই ? ওপাড়ার ঠাকরুণদিদি কি বললেন জান ?

কি ?

হ্যাঁ, তোমায় আমি সেই কথা বলিগে। আক্কেল খুইয়ে যখন তখন ডাকলে তো বলবেই।

আহা, বলই না, অন্তত আমার আক্কেল বজায় রাখবার জন্যেও তো বলা উচিত।

কথাটা পঙ্কজের মনটা আলোড়িত করিতেছিল ; সে ঈষৎ হাসিয়া রাগতভাবে বলিল, কেন ! বললে, বরের সঙ্গে যে বড় আটা হয়েছে দেখছি ! কি ঘেন্নার কথা বল দিকিন ! এই বয়েসে সবার সামনে—

স্বামী কপট গাম্ভীর্য্যের সহিত বলিল, তা বলেছেন ঠিকই, এই বয়েসে বুড়ো বরকে ছেড়ে কোথায় অন্য—

চুপ কর বলছি, আস্পদ্দা !—বড় বড় চোখ দুইটা আরও বড় করিয়া পঙ্কজিনী স্বামীকে থামাইল ; তাহার পর জিজ্ঞাসা করিল, নাও, কেন ডাকছ বল ; দেরি হয়ে যাচ্ছে ওদিকে।

একজন অবধূত পদার্পণ করেছেন ; মস্ত বড়—

পঙ্কজের হাসি-হাসি মুখটা মুহূর্ত্তে অন্ধকার হইয়া গেল। সে বিরক্তভাবে বলিল, তা আসুন, আমার অত ঘি-ময়দা নেই। তা ছাড়া বাড়িতে একটা জামাইয়ের খরচ আছে।

সে সংসারের খবর আমিও খুব রাখি। তা ব'লে সাধু-ফকির একজন দয়া ক'রে যখন এসেছেন—

কেতাত্ত করেছেন। বল, চ'লে গেলে বেশি দয়া করা হবে।—বলিয়া পঙ্কজ চলিয়া যাইতেছিল ; স্বামী কহিল, আরে, শোন।

না ফিরিয়া পঙ্কজ উত্তর দিল, কি ? আমি শুনতে চাই না।

রাত্রে 'হরিকথা' কইবেন, তারও উজ্জুগ-টুজ্জুগ—

ওসব কিচ্ছু হবে-টবে না, ব'লে দিলুম এক কথা। পঙ্কজ উঠান ছাড়িয়া রকে উঠিল।

আর একটা কথা, শুনছ ?

পঙ্কজ আবার না ফিরিয়া উত্তর করিল, না, শোনবার দরকার নেই।

তোমার গিয়ে বিনোদকেও ডেকে দাও ; বাজে ফষ্টি-নষ্টি ছেড়ে একটু সদালাপ শুনবে 'খন।

তুমি একলাই শোন গিয়ে, বিনোদের ভাগ বসাবার দরকার নেই।

তখন এই তত্ত্বান্বেষী পুরুষটি নিজেই দুই পা আগাইয়া ভগ্নীপতিকে ডাকিয়া যাহাতে তাহার আধ্যাত্মিক উন্নতির সুবিধা হয়, সেইজন্য সন্ন্যাসীর নিকট আনিয়া বসাইল এবং সেদিনকার মত সেই অনাধ্যাত্মিক সভাটিও উঠিয়া গেল।

মাত্র দুই-একটা উদাহরণ দেওয়া গেল, কিন্তু এই রকম রসভঙ্গ প্রায়ই ঘটিত। পঙ্কজিনী বর্ষীয়সীদের বিদ্রূপবাণে জর্জ্জরিত হইয়া স্বামীর

উপর ঝাল ঝাড়িত, আচ্ছা, কেন তোমার এমন ধরন বল দিকিন? দু দণ্ড ব'সে একটু আমোদ-আহ্লাদ করে, তাতে তোমার গায়ে ফোসকা পড়ে?

স্বামী তখন একটি লেক্‌চার জুড়িয়া দিত, বলিত, ওই—ওইখানেই তোমাদের সঙ্গে মেলে না আমার। এখন দেখতে হবে, তোমরা যে অসার বাক্যালাপকে আমোদ বলছ, সেটা ঠিক আমোদ কি না, সেটা নির্ণয় করতে হ'লে আগে বুঝতে হবে, শুদ্ধ আমোদের স্বরূপটা কি! তা হ'লে দেখা যাক, শঙ্করাচার্য্য এ সম্পর্কে—

যাঁহারা পঙ্কজিনীকে চিনিয়াছেন, তাঁহারা সহজেই বুঝিতে পারিবেন, এ বক্তৃতা কখনও শেষ হইত না। শুধু স্ত্রীলোকেই পারে, এমনভাবে মুখখানা ঘুরাইয়া লইয়া পঙ্কজ হনহন করিয়া চলিয়া যাইত, বলিত, ক্যামা দাও, ঢের বক্তিমে হয়েছে, যত সব অসৈরণ—

স্বামী স্ত্রীর আধ্যাত্মিক উন্নতি সম্বন্ধে হতাশ হইয়া একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলিত; বলিত, ওই তো মুশকিল, মেয়েমানুষের মন ঠিক জায়গায় আসতে আসতে আবার কেমন বিগড়ে যায়!

৩

যেদিন যাওয়ার কথা ছিল, তাহার আগের দিন পঙ্কজের ননদ অসুখ করিয়া বসিল, সুতরাং যাত্রা স্থগিত হইয়া গেল। স্বামী চটিয়া বলিল, কেবল অনাচারে এটি হয়েছে, এর জন্যে কে দায়ী জান?

পঙ্কজ হাসিয়া বলিল, জানি বইকি। কিন্তু সে শেষ করিবার পূর্ব্বেই তাহার উত্তরটি কি হইবে আন্দাজ করিয়া তাহার স্বামী তাড়াতাড়ি বলিল, ঠাট্টা রাখ, তোমাদের জন্যেই হয়েছে এটি; রাত

দুপুর পর্য্যন্ত হুড়ুদ্দুম ক'রে ঘুমের ব্যাঘাত জন্মানো। আমি তখনই পইপই ক'রে বারণ করতুম; তা গরিবের কথা বাসী না হ'লে তো আর—

পঙ্কজ একটু সঙ্কুচিতভাবে বলিল, হ্যাঁ, এ বয়েসে রাত জাগলে নাকি আবার অসুখ করে?—বলিয়া সলজ্জ কুটিল হাসির এমনই একটি সঙ্কেত করিয়া স্বামীর মুখের দিকে চাহিল যে, তাহার আচারশুদ্ধ মনেও বহু পুরাতন স্মৃতির একটি অসংযত সৌরভ ক্ষণিকের জন্য জাগিয়া উঠিল;—সেই তাহারা দুইটিতে যখন অনর্থক উদ্দেশ্যহীন আলাপে কত বিনিদ্র রজনী অক্লান্তভাবে কাটাইয়া দিত, যখন গ্রীষ্মের রাত্রি উত্তাপ হারাইয়া আর শীতের রাত্রি শৈত্য হারাইয়া কোথা দিয়া যে চলিয়া যাইত—সেই সব দিনের কথা। মনে পড়ে, এক শ্রাবণের রাতে পঙ্কজ অভিমানভরে পাশ ফিরিয়া শুইয়া ছিল, হাজার মিনতিতেও কথা কয় না, ফিরে না; তারপর হঠাৎ একটা মেঘের ডাকে মুহূর্ত্তে ফিরিয়া সে তাহার বুকে ভয়ে মিশিয়া গিয়াছিল। স্বামী বধূকে বলিয়াছিল, তোমার চেয়ে বাজও কোমল, সে আমার কাতরানি শুনলে।

স্বামী কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য নিষ্ঠা, সংযম প্রভৃতি দশবিধ সোপানের কথা ভুলিয়া অনেক দিন পরে স্ত্রীর মুখের পানে চাহিয়া যৌবনের সেই বিহ্বল হাসি একটু হাসিল, এবং এই ভাবের আমেজে আর একটা কি শাস্ত্রবিরুদ্ধ কাজ করিবার জন্য মুখটা বাড়াইয়া হঠাৎ নিজেকে সামলাইয়া লইল ও হাসিয়া বলিল, দিন দিন ব'য়ে যাচ্ছ তুমি।

স্ত্রীও শুধু একটু হাসিল, তাহার পর বলিল, ঠাকুরঝিকে তো আর কয়েক দিন পাঠানো যাবে না, কিন্তু ঠাকুরজামাই আর থাকতে চান না যে!

ও বোধ হয় ভাবছে, শ্বশুরবাড়িতে আর কত দিন কাটাব, তা

আমি বুঝিয়ে বলব 'খন। কাছেপিঠে নয় তো যে, আবার দুদিন পরে এসে নিয়ে যাবে।

প্রতিদিনই উপশম হইবার আশা দিয়া অসুখটা দশ-বারো দিন পর্য্যন্ত বিস্তার করিল এবং তাহার পর রোগিণীটিকে এমনই নিস্তেজ করিয়া দিয়া গেল যে, তাহার আর উঠিয়া চলাফেরা করিবার সামর্থ্য রহিল না। দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল, যেন প্রাণটি নেহাত নিরাশ-ভাবেই এই শুষ্ক দেহের অবলম্বন ধরিয়া ঝুলিতেছে।

লাজুক বরটি বড় মুশকিলে পড়িয়া গেল। শ্বশুরবাড়িতে আর অধিক দিন থাকাও যায় না, অথচ নূতন বালিকা-বধূটির জন্যও প্রাণটি নিতান্ত কাতর হইয়া পড়িল। বাড়িতে গিয়া পাঁচ-সাত দিন অন্তর শ্যালকের এক-আধখানা চিঠির উপর ভরসা করিয়া সে যে কি করিয়া থাকিবে, তাহা ভাবিয়া পাইল না। এই তো এইখানেই দিনের মধ্যে কতবার করিয়া খবর পাইতেছে এবং কাছে বসিবার সুযোগও বউদিদি যথেষ্ট করিয়া দিতেছেন, কিন্তু তাহাতেও তো উৎকণ্ঠার অন্ত নাই,—চোখের আড়াল হইলে আর প্রাণে সোয়াস্তি নাই।

এ অবস্থায় যখন শ্যালক আসিয়া হিন্দুদের বৈবাহিক আচার-ব্যবহার, স্ত্রী-পুরুষের শাস্ত্রসঙ্গত প্রকৃত সম্বন্ধ, এবং অন্যান্যের প্রতি শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য প্রভৃতি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করিয়া একটি সারবান উপদেশ দিয়া বলিল, তাহার থাকাটা একান্ত প্রয়োজন, এবং পাড়ার প্রবীণাদের দ্বারাও যখন সেই কথাই বলাইল, এবং তাহার উপর আবার যাইবার কথা তুলিতে শ্যালকজায়া যখন তাচ্ছিল্যভরে হাসিয়া জানিতে চাহিল, বউয়ের অসুখে মাথা-খারাপ হইয়া গিয়াছে কি না, তখন বেচারা যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। ইহার পরে যাহা সামান্য একটু দ্বিধা ছিল, তাহা নিঃশেষ হইয়া গেল বধূটি যখন বড়ই অভিমানভরে

ঠোঁট দুইটি কাঁপাইয়া বলিল, তা যাবে বইকি। আমি আর তোমার কে?

এ কথার পরেও কে চলিয়া যাইতে পারে, জানি না। কিন্তু সে থাকিয়া গেল। বাড়িতে লিখিয়া দিল, তাহার নিজের শরীর খারাপ, কিছুদিন যাওয়া চলিবে না, তবে ভাবিবার কিছুই নাই। নববধূটির মায়ায় আটকাইয়া রহিল। সত্য কথাটুকু লিখিতে যেন কেমন কেমন বোধ হইতেছিল। এখানে বউদিদিকে বলিয়া দিল, বাড়িতে আর চিঠি দেওয়ার দরকার নেই, আমি সব কথা লিখে দিয়েছি। এবং বধূকে বলিল, সেখানে গিয়ে যেন সব কথা ফাঁস ক'রে দিও না, বড্ড লজ্জায় পড়তে হবে তা হ'লে।

বধূটি ছোট্ট মাথাটি দুলাইয়া বলিল, তা ব'লে তোমার অসুখ করেছিল, এমন অলুক্ষুণে মিছে কথা বলতে পারব না।

ইহাতে নবপরিণীত যুবকটি একটা অপরিসীম তৃপ্তি অনুভব করিল এবং বধূর মুখের কাছে মুখটি লইয়া গিয়া আবেগভরে কহিল, মিছে কথা আর কি? মনের অসুখ কি অসুখ নয় শৈল? আমি যে কি অসুখে রয়েছি, কি বুঝবে তুমি? এর চেয়ে তুচ্ছ শরীরের অসুখ যে—ইত্যাদি অনেক কথা, যাহা না লিখিলেও স্ত্রী-পুরুষ সকলেই আন্দাজ করিয়া লইতে পারেন।

মোদ্দা কথাটা হইতেছে, সে মাসখানেক থাকিয়া গেল। কলেজের পার্সেণ্টেজের কথা হিসাব করিল বটে, কিন্তু পার্সেণ্টেজের জন্য যেমন এ পর্য্যন্ত কোন ছাত্রেরই জীবনের প্রিয়তম কাজটিতে বাধা পড়ে নাই, সেইরূপ তাহারও পড়িল না। সে মনে মনে এই সুদীর্ঘ মানবজীবনের যৌবনের অচিরস্থায়ী দিনগুলার পার্সেণ্টেজ এবং তাহারও মধ্যে আবার নবপরিণয়ের এই স্বপ্নাবিষ্ট দিনগুলার পার্সেণ্টেজ কষিয়া ফেলিল।

ফলে যতদিন পর্য্যন্ত না বধূটি আরোগ্যলাভ করিয়া সক্ষম হইয়া উঠিল, সে আর তাহার কাছ-ছাড়া হইল না।

যখন বধূকে নিজের মুখে কহিতে শুনিল যে, আর তাহার বিশেষ কোন কষ্ট নাই, তখন শ্যালকজায়ার নিকট আরজি পেশ করিল, বউদি, এবার যেতে হচ্ছে—একটা দিন-টিন—

পঙ্কজ গাল দুইটি ভার করিয়া বলিল, তা কি দিয়ে আর রুকে রাখব ভাই? রোকবার যা, তা তো সঙ্গে চলল। কিন্তু এখনও বড্ড কাহিল নয়?

না, আর তেমন কাহিল কি? শরীর তো বেশ সেরে উঠেছে।

পঙ্কজ চাপা হাসির সহিত হঠাৎ ঘাড়টা কাত করিয়া গালে তর্জ্জনীটা টিপিয়া বলিল, ওমা, তাও তো বটে, আজকাল ঠাকুরঝির শরীরের কথা আর আমরা কি জানব?

বেচারা বরটি লজ্জিত হইয়া পড়িল। হাসিয়া বলিল, এইজন্যেই আপনার কাছে বলতে সাহস হয় না বউদি; কিন্তু ঠাট্টা রেখে দাদার সঙ্গে পরামর্শ ক'রে একটা দিন-টিন দেখুন। আর তাও বলি, দাদারও শরীরটা বাইরে প'ড়ে থেকে থেকে খারাপ হয়ে গেছে; ওটা তো আর ঠাকুরঝির শরীর নয় যে, পরেই ভাল তদারক করবে।

যে বিদ্রূপ অন্তরের কথাটির সহিত মিলিয়া যায়, তাহার আর ভাল জবাব যোগায় না। সলজ্জ সঙ্কোচের সহিত পঙ্কজ শুধু বলিল, এই যে মুখ ফুটেছে!—বলিয়া সে তাড়াতাড়ি সে স্থান পরিত্যাগ করিতে যাইতেছিল, এমন সময় 'বেদান্তদর্পণে'র সে পাতাটা পাওয়া গিয়াছে কি না—প্রশ্ন করিয়া স্বামীটি সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

দশ বৎসরের বালকের মা পঙ্কজ নিজেকে সামলাইয়া লইতে পারিল না। নন্দাইয়ের এই ঠাট্টাটুকুর পরেই স্বামীকে সামনে পাইয়া নূতন

বধূটির মতই শরমে রাঙা হইয়া ত্বরিতপদে ঘরের ভিতর আশ্রয় লইল।

ননদটি আজ চলিয়া গিয়াছে।

পঙ্কজের মনটা সমস্ত দিন বড় ছোট হইয়া আছে। ছোট কন্যার মত মানুষ-করা ছেলেমানুষ ননদটি বুকের মাঝখানটায় এমন খানিকটা শূন্যতা সৃজন করিয়া গিয়াছে যে, সেটা আর কিছু দিয়াই পূর্ণ করা যায় না। কেবলই মনে হইতেছে, আহা, এটি ও বড় ভালবাসিত; আহা, বড় ছেলেমানুষ; আহা, কিছু শেখে নাই সে।

বাড়িটিও দুইদিন হাস্যকলরবে অধিকতর পূর্ণ হইয়া হঠাৎ যেন নির্ব্বাণশিখা প্রদীপটির মত মলিন হইয়া গিয়াছে। নূতন-পরিচিত যুবকটি—যে কৌতুক-আলাপের মধ্য দিয়া ছোট ননদিনীর পার্শ্বে তাহার হৃদয়ে একটি স্থান অধিকার করিয়া লইয়াছে, তাহার কথাও বড় বেশি মনে হইতে লাগিল। তাহাকে লইয়া কখন কি অত্যাচারটি করা হইত, প্রবহমান দিনটির প্রহরে প্রহরে মনে পড়িয়া মনটাকে আকুল করিতে লাগিল। বিকালবেলায় সে আর বাড়ি থাকিতে পারিল না। প্রতিবেশীর বাড়িতে গিয়া বিগত কুড়ি-পঁচিশ দিনের খুঁটিনাটি সব আলোচনা করিয়া ভারী মনে কাটাইয়া দিল।

স্বামী বাড়ি ছিল না, নূতন রাস্তা, তাহাতে আবার রেলে কয়েকটি বদলি আছে, সে ভগ্নীপতিকে খানিকটা আগাইয়া দিতে গিয়াছে। কাল সন্ধ্যার পূর্ব্বে ফিরিবে না। চাকরটা পর্য্যন্ত সঙ্গে গিয়াছে।

পঙ্কজ সকাল সকাল ছেলেমেয়েদের আহার করাইয়া শুইয়া রহিল, সেদিন নিজের ঘরে গিয়া শুইতে ইচ্ছা হইল না। শুইয়া ননদ-নন্দাইয়ের চিন্তার পাশে অলক্ষিতে আর একজনের যে চিন্তাটা আসিয়া

উদয় হইল, সেটা স্বামীর—বড় অগোছালো বেহিসাবী মানুষ, ঘর ছাড়িয়া খুব কমই বাহিরে যায়।

পরদিন নূতন করিয়া ঘরদোর গুছাইতে, পুরানো রাস্তায় চালাইবার পূর্ব্বে একবার সংসারটাকে দেখিয়া লইতে কাটিয়া গেল। সকলের মধ্যেই যেন পঙ্কজের মনে হইতে লাগিল, স্বামীর জন্য এতদিন যথেষ্ট করা হয় নাই। আজ যে হঠাৎ এত দরদ কোথা হইতে উদয় হইল, সে বুঝিতে পারিল না, বুঝিবার চেষ্টাও করিল না। শুধু যেখানে যেখানে পারিল, স্বামীর জন্য প্রচুর ত্যাগ স্বীকার করিয়া নূতন বন্দোবস্তটা যতদূর পারিল নিরন্ধ্র করিয়া দাঁড় করাইল, এমন কি ঘরদুয়ার গুছাইতে গুছাইতে ননদ-নন্দাইয়ের কথা ভাবিতে ভাবিতে তাহার ইহাও মনে হইতে লাগিল, আহা, এই তালে যদি ওর সেই বইয়ের পাতাটা পেয়ে যেতুম; কতবার যে বলছে, গা করা হয় নি!

কবে দুইটা রূঢ় কথা বলিয়াছে, কবে একটা আবেদন-অনুরোধ হেলায় অগ্রাহ্য করিয়াছে, নন্দাই থাকিবার সময় আমোদ-প্রমোদে বাধা পাইয়া কবে একটু অবহেলা বিরক্তি দর্শাইয়াছে, সমস্ত আজ তাহার মনের মেঘে এপার ওপার করিয়া এক-একটা বেদনার বিজলিরেখা টানিয়া দিতে লাগিল। সন্ধ্যার সময় স্বামী আসিবে; কত দিনের বিরহিণীর মত পঙ্কজ সূক্ষ্ম যত্নের সহিত অভ্যর্থনার আয়োজন করিয়া রাখিতে লাগিল। ঝকঝকে করিয়া মাজা গাড়ুটা টাটকা জলে পূর্ণ করিয়া পাট-করা গামছায় ঢাকা দিয়া পা-ধোয়ার জায়গায় রাখিয়া দিল। আলনায় আহ্নিক করিবার গরদের কাপড়টি এবং তাহার পর পরিবার থান-কাপড়টি মিহি করিয়া কোঁচাইয়া টাঙাইয়া রাখিল। যখন যেটি দরকার, হাতের কাছে করিয়া গুছাইয়া রাখিল। বহুদিনের অনাদৃত

স্বামীর আদরের পাত্রী মেজো মেয়েটিকে পর্য্যন্ত ফিটফাট করিয়া ধুইয়া মুছিয়া সাজাইয়া রাখিল। সন্তানের মুখে বক্ষের স্তন্য উজাড় করিয়া দিয়াও প্রসূতির যেমন অতৃপ্তি থাকিয়া যায়, সেইরূপ তাহারও যেন হাজার করিয়াও আশ মিটিতেছিল না।

তাহার পর সে বিছানা রচনা করিবার জন্য খাটের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। হঠাৎ শরীরে কিসের যে একটা প্রবাহ খেলিয়া গেল, পঙ্কজের সমস্ত শরীরটা রোমাঞ্চে শিহরিয়া উঠিল। নবদম্পতির সদ্যত্যক্ত গৃহে বিলাসের মোহ এখনও লিপ্ত হইয়া আছে। ফুলের ও এসেন্সের মিশ্রিত মৃদু গন্ধে ঘরটি আমোদিত। শয্যার মাথার দিকের এক কোণে একটা গন্ধ তীব্র হইয়া উঠিতেছিল, কুতূহলী হইয়া চাদরের কোণটা উঠাইয়া সে দেখিল, একটি বকুলের মালা সন্তর্পণে কুণ্ডলী করিয়া রাখা। পঙ্কজ একটু হাসিয়া সেটা বাহির করিয়া লইল। তাহার পর অন্য দিকে চাহিয়া অন্যমনস্কভাবে মালাটা দুই হস্তের অঙ্গুলির মধ্যে জড়াইয়া খুলিয়া আংটির মত পরিয়া, আবার মণিবন্ধে বলয়ের মত পরিয়া খেলা করিতে লাগিল।

আজ যৌবনের সায়াহ্নে পঙ্কজের প্রথম যৌবনের কথা মনে পড়িয়া গেল। এই সেই গৃহ—এই রকম গন্ধেরও রেশ মাথার মধ্যে যেন ঘনাইয়া উঠিতেছে—তাহাদেরও ঘর আলো করিয়া নিশ্চয়ই এমনই ফোটা ফুলের মেলা তখন বসিত, আর তাহার পায়ের কাঁচা আলতাও কি এমনই করিয়া যেখান সেখান রাঙাইয়া দিত না? দিত নিশ্চয়, কিন্তু কই, তখন তো সে এত কথা বুঝে নাই! জীবনে তখন যে বসন্ত আসিয়াছিল, তাহার অভ্যর্থনার কলগীতি তো তেমন করিয়া গাওয়া হয় নাই! স্বামী কতটুকু কদর করিয়াছিল, কে জানে—এখন ভাল করিয়া মনে পড়ে না। আর এই তো ভোলানাথ স্বামী—এর

কাছে নিজেই যখন নিজের যৌবন-সম্পদকে ভাল করিয়া পরিচিত করিয়া দিতে পারে নাই, তখন কি আর যথাপ্রাপ্যটুকু পাওয়া গিয়াছিল!

আজিকার গৃহিণী পঙ্কজিনী সেদিনকার পনরো বৎসরের বধূ পঙ্কজিনীকে সখীর মত বক্ষের মধ্যে চাপিয়া ধরিল। অন্তর তাহার ব্যর্থতার বেদনায় মথিত হইয়া উঠিল। তাহার পর ধীরে ধীরে একটা কথা, যাহা এতক্ষণ বাষ্পাকারে মনের মধ্যে ভাসিয়া বেড়াইতেছিল, স্পষ্ট হইয়া উঠিল। বাম হস্তে জড়ানো বকুলের মালাটা দক্ষিণ হস্তে আবেগ-ভরে চাপিয়া ধরিয়া বালিশের মধ্যে মুখ গুঁজিয়া পঙ্কজ ভাবিল, এখনও কি সে ভুল শোধরানো যায় না? একদিনের জন্যও নয়—এক মুহূর্ত্তের—?

এবার একটু সামলাইয়া লইয়া ভাবিল, কেন হইল এমনটা? তাহার একটা সুস্পষ্ট উত্তর খুঁজিয়া পাইল না বটে; তবে বিগত সমস্ত মাসটা ব্যাপিয়া ননদ-নন্দাই, পাড়াপড়শী আর সখীবৃন্দ লইয়া যে হাস্যকলরবে কাটানো গিয়াছে, তাহারই স্মৃতি মনের মধ্যে স্বপ্নের আমেজে জাগিয়া উঠিল; আর তাহার পর এটা অন্তত বেশ বুঝিতে পারিল যে, মনটা পূর্ব্ব হইতেই শিথিল হইয়া পড়ুক আর নাই পড়ুক, আজ এই শূন্য গৃহের মধুময় স্মৃতি তাহাকে পূর্ণভাবেই অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছে—আজ আর তাহার আকাঙ্ক্ষার উপর সংযম নাই, তা সে হাজারই বিসদৃশ হউক না কেন।

পঙ্কজিনী গিয়া আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইল। প্রথমটা নিজের প্রতিচ্ছবি দেখিয়াই বালিকাটির মতই লজ্জায় সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল। তবে এ ভাবটা রহিল না। ক্রমে সে যত্ন করিয়া কবরী বাঁধিল; মুখটি ভাল করিয়া মুছিয়া কপালে একটি খয়েরের টিপ পরিল; তুলিয়া-রাখা

কানের দুলজোড়া বাহির করিয়া কানে দুলাইয়া মাথার কাপড়ে ঢাকিয়া রাখিল ; পায়ে আলতা দিল ; অধরোষ্ঠও রঞ্জিত করিতে যাইতেছিল, কিন্তু কি ভাবিয়া আর করিল না। আয়নায় নিজের ছায়াটিকে চোখ রাঙাইয়া বলিল, মরণ আর কি, বড় বাড় যে !—তাহার পর সীমন্তে মিহি করিয়া সিন্দূরের রেখা টানিয়া দিয়া সুন্দর মুখখানিকে হেলাইয়া দুলাইয়া আরশিতে নিজেকে একটু ভাল করিয়া দেখিয়া লইল। একটা ভাল কাপড় পরিবার ইচ্ছাও হইল ; কিন্তু পুত্রকন্যাদেবরের মধ্যে নিতান্ত বাধ-বাধ ঠেকিতে লাগিল। তবে একখানি ভাল কাপড় ট্রাঙ্ক হইতে বাহির করিয়া আলনায় স্বামীর পিরানের নীচে লুকাইয়া রাখিল—সময় বুঝিয়া পরিবে। তাহার পরে বহুদিনের ছাড়া শয্যাটি প্রাণের সমস্ত দরদ দিয়া রচনা করিয়া, তাহার এই সমস্ত আয়োজনের দেবতার জন্য অন্তরের কাতর প্রতীক্ষা লইয়া সংসারের কাজে আনমনা হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

এদিকে তাহার দেবতাটি যখন বহুদূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া ছোট ভগ্নীটিকে বিদায় দিল, তখন তাহার শান্ত সমাহিত চিত্তেও মায়ার একটা তীব্র আঘাত লাগিল। ইহার আগে যে মুখ সে কখনও অশ্রুসিক্ত হইতে দেখে নাই, অশ্রুজলে-ভরা বিদায়কালীন সেই ছোট মুখটি তাহার মনে বিষাদের একটা মৌন ছবি আঁকিয়া দিল, যাহা সে শাস্ত্রের কোন বচন দিয়াই মুছিয়া ফেলিতে পারিল না। ইহাতে অন্য কোন অবোধ মানবকে বোধ হয় সংসারের আপন জনগুলির কাছে নিবিড়তর করিয়া টানিয়া আনিত ; কিন্তু এই সতর্ক মুক্তিকামীকে আরও স্বতন্ত্র করিয়া আরও দূরে সরাইয়া দিল। সে ভাবিল, ইহা কিছুই নয়, 'তাঁহার' একটা পরীক্ষা মাত্র। যে ভববন্ধন হইতে ত্রাণ পাইতে চাহে,

তাহাকে এই অগ্নিপরীক্ষায় উতরাইয়া যাইতেই হইবে, নহিলে সমস্ত সাধনাই পণ্ড।

সেইজন্য শাস্ত্রও যখন এই মিথ্যা অবিদ্যাজাত মায়ার নিকট পরাস্ত হইল, সে স্থির করিল, একেবারে বাড়ি না গিয়া রাস্তায় দুই-এক দিবস গুরুগৃহে থাকিয়া বিক্ষিপ্ত মনটা সুস্থির করিয়া লইবে। আর অনেক দিন গুরুদেবের চরণদর্শনও ঘটে নাই; যখন এতটা আসাই গিয়াছে, তখন এই সুবিধাটুকু ছাড়াও উচিত নয়। তাই ফিরিবার পথে সে আর বাড়ি পর্য্যন্ত নিজের টিকিট করিল না। শুধু চাকরটাকে পাঠাইয়া দিল, আর বলিয়া দিল, ব'লে দিস, যদি গুরুদেবের সঙ্গে আবার গঙ্গাস্নানটা সেরে আসবার ঝোঁক হয় তো চাই কি আরও দুই-এক দিন দেরি হয়ে যেতে পারে। আর দেখিস, মেয়েটাকে যেন না বেশি বকে-টকে।

পঙ্কজ সমস্ত আয়োজন নিখুঁত করিয়া শেষ করিল; সকাল সকাল সংসারের কাজকর্ম্ম সারিয়া লইল এবং আর সকলের আহারাদি পর্য্যন্ত মিটাইয়া, ছোট—সেই দুরন্ত ছেলেটিকে বুকে চাপিয়া আবেশ-শিথিল চরণে শয়নগৃহে প্রবেশ করিল।

এই সময় দেবর আসিয়া খবর দিল, দাদা আজ আর এলেন না বউদি, দুখীরাম একলা ফিরে এসেছে।

পঙ্কজ শূন্য দৃষ্টিতে দেবরের দিকে চাহিয়া রহিল, কোন কথাই কহিতে পারিল না। দুখীরাম নিজেই আসিয়া বলিল, হ্যাঁ, তেনার মনটা বড় খারাপ দেখলাম বউমা, বোধ হয় গুটঠাকুরের সঙ্গে তিথি-টিথি সেরে আসবেন পাঁচ-সাত দিন পরে, গুটঠাকুরও বোধ হয় পায়ের ধূলো দেবেন একবার।

পৃথ্বীরাজ

১

পৃথ্বীরাজ, টিপু স্থলতান আর পিণ্ডারী-দস্যুদলের মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ বাধিয়া গিয়াছে। পিণ্ডারীদের দুই-তিনজন আহত হইয়া ধরাশয্যা লইয়াছে, তবু দুর্দ্ধর্ষ দলটা হটিতে চাহে না। টিপু স্থলতানের কানের কাছ দিয়া একটি আঁকাবাঁকা আমের ডাল বোঁ করিয়া বাহির হইয়া গেল; সেটা কুড়াইয়া লইয়া দস্যুদের আক্রমণ করিতে যাইবে, এমন সময় পৃথ্বীরাজের করচ্যুত একটা মাটির চাংড়া পিণ্ডারী-সর্দ্দারের নাকের উপর পড়িয়া তাহার নাকের নীচেটা রক্তে এবং মুখের বাকিটা ধূলায় ধূসরিত করিয়া দিল।

এই সময় স্কুলের টিফিন-পিরিয়ড় শেষ হওয়ার ঘণ্টা পড়িল। টিপু স্থলতান এবং অক্ষত পিণ্ডারী কয়জন ছুটিয়া গিয়া ক্লাসে বসিয়া অত্যন্ত মনোযোগের সহিত যে যাহার পড়া শুরু করিয়া দিল। তিনটি পিণ্ডারী আহত হইয়াছিল, তাহারা নিজের নিজের জখমে হাত দিয়া মন্থর-গতিতে স্কুলের দিকে আসিতে লাগিল। রণক্ষেত্রে রহিল মাত্র পৃথ্বীরাজ এবং পিণ্ডারী-সর্দ্দার। বিজেতা গিয়া আহত শত্রুকে সমবেদনার কোমল স্বরে প্রশ্ন করিল, বড্ড লেগে গেছে, না ভাই?

পিণ্ডারী বলিল, বেশি নয়। ইস, তোর পাটা—

ও কিছু নয়; দাঁড়া, কাপড়ের খুঁটটা একটু ভিজিয়ে নিয়ে আসি।—বলিয়া পৃথ্বীরাজ একটু খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে জলের ঘরের দিকে ছুটিল। জল আনিয়া নাকটা মুছাইয়া দিতেছিল, পিণ্ডারী বলিল, এর পরেই নবীন মাস্টারের ক্লাস, আজ আবার নতুন বেত কেড়েছে।

এমন সময় স্কুলের বারান্দা হইতে টিপু সুলতান হাঁক দিল, তোমরা সব এস শিগগির, স্যার ডাকছেন ; খেলা যে তোমাদের শেষ হতে চায় না !

পিণ্ডারী বলিল, নিশ্চয় সব ব'লে দিয়েছে।

পৃথ্বীরাজ বলিল, তা'লে আজ এসপার কি ওসপার যা হয় একটা করব, ওকে আস্ত রাখব না।

বারান্দা হইতে তাগাদা আসিল, চ'লে এস, স্যার কতক্ষণ ব'সে থাকবেন ?

দুইজনে উগ্রভাবে চাহিয়া দেখিল ; পৃথ্বীরাজের চেহারাটা অত্যন্ত কালো এবং চোখ দুইটা অত্যন্ত সাদা বলিয়া করুণার চক্ষে চাহিলেও উগ্র দেখায়। আহত পিণ্ডারী-দস্যু কয়টি থামের আড়ালে ইহাদের অপেক্ষায় ছিল ; সকলে একসঙ্গে প্রবেশ করিল। টিপু নিজের আসনে বসিয়া একটা বই খুলিয়া বলিল, স্যার, আমরা ততক্ষণ সময় নষ্ট না ক'রে পুরনো পড়া করি।—বলিয়া একবার অপরাধীদের পানে চাহিল।

নবীন মাস্টার প্রশ্ন করিলেন, রস্‌কে, পৃথ্বীরাজের তারিখ কত ?

রসিক অর্থাৎ বর্ত্তমান ঘটনার পৃথ্বীরাজ চুপ করিয়া রহিল।

নবীন মাস্টার আবার প্রশ্ন করিলেন, মাখ্‌না, টিপু সুলতান কোন্ সালে জন্মেছিল ?

মাখনলাল অর্থাৎ এই আখ্যায়িকার পিণ্ডারী-সর্দ্দার যেন তারিখটা 'পেটে আসছে মুখে আসছে না' ভাব দেখাইয়া কড়িকাঠের দিকে চাহিয়া রহিল।

নবীন মাস্টার বলিলেন, হুঁ। আর আপনারা দয়া ক'রে বলতে পারেন, পিণ্ডারীরা আকবরের কে হ'ত ?

যে তিনটিকে আহত পিণ্ডারী-দস্যু বলিয়া পরিচিত করিয়াছি, তাহাদের দুইজনে, যেন ভয়ানক মুখস্থ আছে এই ভাবে মনে করিবার ভঙ্গিমায় দ্রুত ঠোঁট নাড়িতে লাগিল। তৃতীয়টি অত্যন্ত ঘাবড়াইয়া গিয়াছিল। নবীন মাস্টারের রসিকতা ধরিতে না পারিয়া বৈরাম খাঁর সহিত গোলমাল করিয়া বলিয়া ফেলিল, আকবরের পিসেমশাই হ'ত স্যার।

সপাৎ করিয়া বেত নামিল।—আকবরের পিস্তেমশায় হ'ত;—ভিন্সেণ্ট স্মিথের ঠাকুরদাদা রায় দিলেন। অন্য পিঠগুলাতেও সপাসপ সপাসপ আওয়াজ হইতে লাগিল। নবীন মাস্টার গর্জ্জাইতে লাগিলেন, লক্ষ্মীছাড়া সব, পেটে বোমা মারলে হিষ্ট্রির একটা অক্ষর বেরোয় না—পৃথ্বীরাজ, টিপু স্থলতান আর পিণ্ডারীদের একসঙ্গে লড়াই হচ্ছে! হিষ্ট্রির পিণ্ডি চটকানো হচ্ছে! এই রস্‌কে লক্ষ্মীছাড়া হচ্ছে হারামজাদার জড়!

আবার সপাৎ সপাৎ করিয়া বেতের ঘা পড়িতে লাগিল।

রসিকের কালো মুখ রাগে, অপমানের যন্ত্রণায় তামাটে হইয়া উঠিয়াছিল। উস উস করিয়া চোখ-মুখ কুঁচকাইয়া মার খাইল। শেষ হইলে প্রচণ্ডভাবে একবার টিপুর দিকে চাহিয়া লইয়া দাঁতে দাঁত পিষিয়া বলিল, আমরা একটুও মারামারি করি নি; কে বলেছে?

নবীন মাস্টার হঠাৎ বেত বন্ধ করিয়া দিলেন, ডাকিলেন, অন্তা!

অনন্তকুমার অর্থাৎ আজিকার টিপু স্থলতান মাস্টারকে শুনাইয়া,—আমায় এখানটা একটু বুঝিয়ে দাও তো ভাই।—বলিয়া সবে পাশের ছেলের নিকট জিওমেট্রির একটা পাতা মেলিয়া ধরিয়াছিল; আহ্বান-মাত্রেই উঠিয়া দাঁড়াইয়া উত্তর দিল, আজ্ঞে স্যা—র!

এরা আজ মোটেই লড়াই করে নি?

করেছিল বইকি স্যার; আমি স্যার, কত ক'রে বুঝিয়ে বললাম স্যার, টিপিন-পিরিয়াডটা কি ভাই হুড়োহুড়ি দাপাদাপি করবার জন্যে স্যার দিয়েছেন? তা আমার কথা স্যার—

আর শেষ করিতে হইল না, রসিক বাঘের মত একটা লাফ দিয়া অন্তার ঘাড়ে পড়িল এবং তাহার মাথাটা নিজের বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া চাপা কান্নার একটা 'গি-গি' শব্দ করিতে করিতে কিল চড় আঁচড়ানি কামড়ানি যাহা সুবিধা পাইল, তাহাই দিয়া নিজের আশ মিটাইয়া মাথাটা ঝাঁকানি দিয়া পিছনে ঠেলিয়া দিল এবং পলকের মধ্যে নবীন মাস্টারের লাঠিটা টেবিল হইতে তুলিয়া লইয়া এক দৌড়ে সদর-রাস্তার উপর আসিয়া দাঁড়াইল। সেখানে দাঁড়াইয়া লাঠিটা খেলাইয়া চীৎকার করিতে লাগিল, আজ সমস্ত ইস্কুল এক ধারে, আর রসিক এক ধারে। একটা এসপার কি ওসপার যা হয় কিছু করব; চ'লে আয় অন্তা, মরদকা বাচ্চা হ'স তো।

সমস্ত স্কুলটা বারান্দায় আসিয়া জড় হইল। শিক্ষকেরা 'ধ'রে আন্ ছোঁড়াকে, ধ'রে আন্' বলিয়া অনিশ্চিতভাবে হুকুম করিতে লাগিল; কিন্তু কেহই আর বারান্দা হইতে নামিতে সাহস করিল না। দারোয়ান রামভজ্জু, 'হামি যাবে, হালমানজীকে কিরপাসে' বলিয়া নামিয়া গটগট করিয়া কয়েক পা অগ্রসর হইল। রাস্তায় বিছাইবার জন্য এক জায়গায় পাথর-ভাঙা জড় করা ছিল। চ'লে আয়, এই তো মাংতা হ্যায়!—বলিয়া রসিক সেইখানে গিয়া দাঁড়াইল। রামভজ্জু পিছনে ফিরিয়া দেখিতে দেখিতে তাড়াতাড়ি বারান্দায় ফিরিয়া আসিল। বলিল, ও ডাকু আছে; ইস্কুলের গাছের আমগুলো কে ঢিল মেরে লুকসান করিয়েসে বাবু? ওহি তো।

২

রসিকের এই প্রথম অপরাধ নয়, এবং এইটাই যে সবচেয়ে উৎকট তাহাও নহে। ছোকরা পৃথ্বীরাজ, টিপু সুলতান, শিবাজী, নাদিরশাহ প্রভৃতি কয়েকটি দুর্দ্দম ঐতিহাসিক চরিত্রের অত্যন্ত পক্ষপাতী এবং তাহাদের ভূমিকায় এ যাবৎ যে সব দৌরাত্ম্য করিয়াছে, তাহার এক-একটাতেই এক-একটি রোমাঞ্চকর কাহিনী হইয়া দাঁড়ায়। সে সব ভীষণ ব্যাপারের উল্লেখ যত কম করা যায়, ততই ভাল।

রসিকের নাম কাটিয়া দেওয়া হইল। তাহার পিতা গিয়া হেড-মাস্টারের হাতে ধরিলেন। নূতন লোক—কড়া প্রিন্সিপ্‌লের, বলিলেন, অমন দুর্দ্দান্ত বদমায়েশ ছেলের নাম আর লেখা যেতে পারে না; তবে আমি গুড ক্যারেক্টারের সার্টিফিকেট দিচ্ছি, অন্য স্কুলে আপত্তি করবে না। কি জানেন? ছেলেদের সত্যি কথা বলতে উপদেশ দোব আর নিজেদের কথার কিংবা কাজের একটা—ইত্যাদি।

রসিকের শিক্ষাপর্ব্ব এইরূপে শেষ হইল। পিতা বলিলেন, হতভাগাকে এবার এমন জায়গায় দোব যে, উঠতে বসতে বেত—উঠতে বসতে বেত।

রসিকের ঠাকুরমা উৎকণ্ঠিতভাবে বলিলেন, ওমা, কি অলুক্ষুণে কথা গো! ঢের বিদ্যে হয়েছে; কুলীনের ছেলে—এইবার বিয়ে দিতে আরম্ভ কর। তিনি বেঁচে থাকলে এতদিন কটা বিয়ে যে—

রসিকের পিতা বলিলেন, 'আরম্ভ কর' মানে? তোমরা কি ভেবেছ, কুলীন ব'লে ছেলের গলায় দশ-বারোটি বউ ঝুলিয়ে দোব? আমার চারটে মা, ছটা সেজো খুড়ী, আর তিনটে নিজের পাপ পুষতে

পুষতে নাজেহাল হতে হ'ল; আবার ও পাঠ আমি পড়ি? বিয়ে দোব সেই 'একে চন্দ্র', তাও এখন ঢের দেরি।

রসিকের ঠাকুরমা তখন তিনটি পুত্রবধূ এবং তদনুরূপ নাতনী নাতবউ সকলকে লইয়া একটা কড়া দল তৈয়ার করিয়া অষ্টপ্রহরই কান্নাকাটি শুরু করিয়া দিলেন। প্রথম প্রথম কর্ত্তার অগোচরেই এবং অবশেষে তাঁহার জ্ঞাতসারেই ঘটকিনী যাতায়াত করিতে লাগিল। প্রথমটা কর্ত্তা রোষ এবং বিরক্তি প্রকাশ করিতে লাগিলেন, তাহার পর ঔদাসীন্য এবং অবশেষে ঘটকিনীর হাতের শাঁসালো কন্যাপক্ষের পরিচয় পাইয়া খোশামোদ শুরু করিয়া দিলেন।

শেষে একদিন, স্কুল ছাড়িবার মাস তিনেকের মধ্যে, এক জমিদার রায় সাহেবের কন্যার সহিত রসিকের শুভবিবাহ হইয়া গেল। মেয়েটি থার্ড ক্লাস পর্য্যন্ত পড়া; রসিকেরও বিদ্যার সীমা ওই পর্য্যন্ত বলিয়া সকলে বলিল, বাঃ, এও এক রকম রাজযোটক।

জোড়ে গিয়া রসিক অন্যান্য উপহারের মধ্যে শালীদের তরফ হইতে যোগীন্দ্রনাথ বসুর একখানি 'পৃথ্বীরাজ' মহাকাব্য লাভ করিল। ছয়-সাত দিন পরে যখন ফিরিয়া আসিল, কাব্যখানি হইতে বাছা বাছা অংশ তাহার অনেক কণ্ঠস্থ হইয়া গিয়াছে। মাখনের সঙ্গে দেখা হইতে বলিল, অ্যায়সা এক কেতাব পাওয়া গেছে রে!

মাখন সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিল।

তবে শোন্।—বলিয়া রসিক বইটা হইতে খানিকটা গুরুগম্ভীর কবিতা গড়গড় করিয়া আওড়াইয়া গেল। শেষ করিয়া বুকটা চিতাইয়া অল্প অল্প হাসিয়া মাথা নাড়িতে লাগিল। বলিল, কেমন, রক্ত টগবগ ক'রে ওঠে না?

মাখন নিরীহ ভাল মানুষের মত মাথা নাড়িয়া জানাইল, ওঠে।

রসিক বলিল, বিকেলবেলায় আসিস; সেইখানটায় গিয়ে দুজনে পড়া যাবে—রোজ। শ্বশুরবাড়িতে বউয়ের সঙ্গে পড়তাম। আগে সে চুপিচুপি কি একটা বই বের করলে, কি বিদ্যের বই, তার বউদি বিয়েতে উপহার দিয়েছে—মোটেই ভাল লাগল না। তারপর দুজনে এইখানা পড়তাম। সমস্ত রাত কেটে যেত—তার তো আমার চেয়ে বেশি মুখস্থ হয়ে গেছে; খুব বিদ্বান, ভাই; দেখতেও, সবাই বলে, বেশ; মাথায় তোর মতন হবে—

মাখন বলিল, তোর সঙ্গে কথা কয়?

রসিক বিস্মিতভাবে চাহিল।

মাখন জবাবদিহিস্বরূপ বলিল, বউদি দাদার সঙ্গে কথা কয় না কিনা।

রসিক বিজ্ঞের মত প্রায় উচ্চহাস্য করিয়াই বলিল, ওটা ওদের দিনের বেলা লোক-ঠকানো; রাত্তিরে সব বউয়েরা কথার জাহাজ—তোর বউদিও, আমার বউও। বিয়ে করলে দেখবি, এই রকম অনেক নতুন মজা আছে।

তাহার পর গম্ভীরভাবে কহিল, কিন্তু ভাই, গরিব রসিকের একটা কথা মনে রেখো, যে বাড়িতে মেলা শালাজ আছে, সেখানে বিয়ে ক'রো না, আড়ি পেতে পেতে নাকাল ক'রে মারবে। একদিন রাত্তিরে আমার রক্ত মাথায় উঠে গিয়েছিল, একটা এসপার কি ওসপার করেছিলাম আর কি—বউ পা দুটো জড়িয়ে ধরলে তাই রক্ষে। শালাজ কাকে বলে জানিস তো? হুঁঃ, তুই বেচারী আর কোত্থেকে জানবি? শালার বউ—ডবল কুটুম কিনা, এক নম্বর বদমাইশ। তোদের নবীন মাস্টারের বেতকেও হার মানাতে পারে।

নবীন মাস্টারের নামে তাহার আর একটা কথা মনে পড়িয়া গেল,

জিজ্ঞাসা করিল, অন্তা কোথায় র‍্যা? তাকে একদিন আচ্ছা ক'রে গো-বেড়েন দিতে হবে, সেদিন তেমন জুত হয় নি।

এই রকম ভাবে পনরো-ষোল দিন কাটিল; একদিন রসিক চোখ নাচাইয়া বলিল, তোদের রসিক যে কাঁদিয়ে চলল রে ছোঁড়া, একেবারে যার নাম বিলেত; শ্বশুর টাকা দিচ্ছে।—বলিয়া মাখনের মুখের ভাবটা লক্ষ্য করিবার জন্য চাহিয়া রহিল। একটু পরে তাহার কাঁধে একটা সখ্যতার চাপড় বসাইয়া হাসিয়া বলিল, না রে, না; তুই যে ভেবেই খুন! শ্বশুরের পয়সায় ছেলেকে বিলেত পাঠাবে, বাবা সে বান্দাই নয়। তা ছাড়া আমরা না কুলীন? সে কথা বুঝি ভুলেই গিছলি তুই? শ্বশুর কিন্তু উঠে প'ড়ে লেগেছে ভাই; বলে, এইখানে এসে পড়াশুনো করুক, তারপর বিলেত গিয়ে—

মাখনের মনে অন্য একটা বিষয় তোলপাড় করিতেছিল, কহিল, অন্তাকে মারবার একটু স্থবিধে হয়েছে।

রসিক সাগ্রহে প্রশ্ন করিল, কি রকম?

আমরা যেখানে ব'সে বই পড়ি, সে জায়গাটা টের পেয়েছে; আজ আসবে; আমায় বললে, ব'লে দিস তোর গুরুদেবকে।

রসিক তাহার পিঠে তিন-চারটা ছোট চাপড় দিয়া বলিল, চট ক'রে যা, সেইখানটায় কতকগুলো ইট ভেঙে জড়—

মাখন বলিল, সে রেখে এসেছি, আর নদী থেকে পাঁক তুলে রেখেছি—চোখের জন্যে, আর ভিজে মাটি আর বিচুটির ঢেলা।

রসিক বিস্ময় এবং প্রশংসায় চাহিয়া রহিল; ভাষা পাইল না যে, মনের ভাবটা প্রকাশ করে।

গিয়া দেখিল, একটা কথাও মিছা নয় ; যুদ্ধের মালমসলা গাঁদি করা রহিয়াছে।

কখন আসবে?—বলিয়া বসিয়া গল্প করিতে লাগিল। বলিল, বিলেতে যাবার আমারই কি ইচ্ছে নাকি তোদের ছেড়ে? বউটাও তা হ'লে বাঁচবে না। বউয়ের নাম অমলা। বাবা বলেছে, এ কটা মাস ঠাণ্ডা হয়ে থাকুক, তারপর হেড-মাস্টারকে ব'লে-ক'য়ে নামটা লিখিয়ে দোব 'খন। কেন শ্বশুরের পয়সায় বিলেত যাবে, আর কেনই বা শ্বশুরের ভাতে প'ড়ে থাকতে যাবে? তা, আর ডাংপিটেপনা ছেড়েই দোব ভাবছি ; শুধু একবার অন্তাকে আচ্ছা-আ ক'রে—

মাখন অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া ছিল, বলিল, ওই সব আসছে।

একটা জঙ্গলের মোড় ফিরিয়া চার-পাঁচজন ছেলে দেখা দিল—বিশ-ত্রিশ গজ দূরে। দুই-একজনের পকেট ভারী, মাখন বলিল, ঢিল আছে। অন্তা পিছনে ছিল, কহিল, আরে মাখনা যে! এখানে? তোমরা সব দেখে রাখ ভাই, স্যার আমাদের অত ক'রে একজনের সঙ্গে মিশতে—

কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই পাশের একজনের মাথায় ঠকাস করিয়া একটা ঢিল সজোরে আসিয়া পড়িল। আর একজনের ঠোঁটের উপর একটা বিচুটিবাহক ঢেলা পড়িয়া একসঙ্গে যন্ত্রণা এবং কুটকুটুনিতে অস্থির করিয়া দিল। অনন্তকুমার সুড়ুৎ করিয়া বনের আড়ালে সরিয়া পড়িয়াছিল, সেখান হইতেই বলিল, তোমরা কেউ পিঠ দেখিও না, চালিয়ে যাও ; আমি বাবার বন্দুকটা নিয়ে এলুম ব'লে—

রসিক উৎকট চীৎকার করিয়া তাহাকে তাড়া করিতে তাহার ডান পায়ে একটা আধলা ইট আসিয়া পড়িল, তাহারও উপর অগ্রসর হইতে

একটা ঢিলে কপালটা ফাটাইয়া দিল। বিপক্ষদল অনন্তকুমারের পথ ধরিল।

রসিক নিজের কাপড়টা ছিঁড়িয়া মাখনকে বলিল, বেঁধে দে। তাহার পর তাহার কাঁধে ভর দিয়া খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে বাড়ি চলিল। পথে বলিল, অন্তা হারামজাদা খুব সটকে পড়ল। আচ্ছা, রসিককে কতদিন ফাঁকি দিয়ে থাকবে?

বাড়িতে কান্নাকাটি পড়িয়া গেল। রসিকের বাপ বলিলেন, নাঃ, ভেবেছিলাম, হতভাগাকে ঘরজামাই হতে দোব না; ওর কপালে শ্বশুরবাড়ির ঝাঁটা লেখা আছে, তার আমি কি করব? কাল পর্য্যন্ত ওর শ্বশুরের চিঠি এসেছে—আমি কাটান দিয়ে যাচ্ছিলাম। কিন্তু আর না, দোব বিদেয় ক'রে। যাক, সেখানে গিয়েই থাকুক, আর গ্রামের ত্রিসীমেয় ঢুকতে দোব না।

ঠাকুরমা কান্নার আওয়াজ চড়াইয়া বলিলেন, ওরে, তারা যে বিলেত পাঠিয়ে খেরেস্তান ক'রে অমন সোনার চাঁদকে পর ক'রে দেবে রে! আমার বুড়ো বয়সে কি শেষে এই দুগগতি ছিল! আজ তিনি বেঁচে থাকলে তোরা এমন কথা কি মুখে আনতে পারতিস?

এক সৎমা বলিলেন, তার চেয়ে বউকে নিয়ে এস বাপু, ছেলে ঠাণ্ডা থাকবে 'খন, ডাগর বউ—

অন্য সৎমা পরামর্শ দিলেন, কিংবা আর একটি বিয়ের কথাবার্ত্তা শুরু ক'রে দাও না কেন? ছেলে একটু অন্যমনস্ক থাকবে 'খন। সেই রানাঘাটের মেয়েটি আমার যেন চোখে লেগে আছে।

রসিকের মা কিছু বলিলেন না; শুধু অশ্রুজলের তর্ক চালাইয়া গেলেন।

কিন্তু কোন ফল হইল না। কপালের ঘাটা সারিয়া গেলে শ্বশুরবাড়ির যাত্রী হইয়া রসিক রেলগাড়িতে সওয়ার হইল। গাড়িটা ঠিক ছাড়িবার সময় মাখন প্ল্যাটফর্মের একটা কোণ হইতে সজল নেত্রে মৌনভাবে আসিয়া গাড়ির সামনে দাঁড়াইল। রসিক চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া হাসিয়া বলিল, কোথায় ছিলি রে এতক্ষণ? তাহার পর চাপা গলায় ডাকিল, শোন্।

মাখন কাছে আসিলে চুপিচুপি বলিল, শিগগির ফিরে আসছি; শিবাজী সন্দেশের চেঙারির মধ্যে কেমন বাদশাকে কলা দেখিয়ে পালিয়েছিল, মনে নেই?—বলিয়া মাখনের দিকে চাহিয়া মিটিমিটি হাসিতে লাগিল।

মাখন এই সঙ্কেতের গূঢ় অর্থটুকু হৃদয়ঙ্গম করিয়া হাসিয়া অশ্রুসিক্ত মুখখানি অন্য দিকে ফিরাইল।

৩

রসিকের শ্বশুর রায় সাহেব পান্নালাল রায় চৌধুরী জমিদার, এবং কোটপ্যান্টধারী বাদ দিয়া আর সবার কাছেই প্রবলপ্রতাপান্বিত। রাজসম্মানের ফসল তুলিয়া আবার জমিতে সার দিতেছেন। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের শ্যালক সম্প্রতি ভারতে পদার্পণ করিয়াছে, তাহার একটা হিল্লে করিয়া দেওয়ার দায়িত্ব লাভ করিয়া একটু চিন্তান্বিত আছেন। সাহেব বলিয়াছেন, লোকটি বরফের উপর স্কেটিং করিতে ইংলণ্ডে অদ্বিতীয়। আর কোন গুণ আছে কি না, সাহেব নিজেও বলেন নাই এবং রায় সাহেবেরও প্রশ্ন করিবার সাহস হয় নাই। স্ত্রী পুত্র, আমলা গোমস্তা, দাস দাসী সকলের উপরই তিরিক্ষি হইয়া ক্রমাগতই ভাবিতেছেন,

বরফের ওপর স্কেটিং করে, এমন লোককে কোথায় বসানো যায়? ইতিমধ্যে বেহাইয়ের পত্র আসিল, তিনি রাজি, রায় সাহেব তাঁহার জামাইকে যে রকম ভাবেই না কেন শিক্ষা দান করেন—বিলাতে পাঠাইয়াই হউক কিংবা বাড়িতে রাখিয়াই হউক।

রায় সাহেবের বিলাতে পাঠানোই ইচ্ছা ছিল। জামাই সেখান হইতে একটা কেষ্টবিষ্টু হইয়া আসিলে মেয়েদের জিদে কুলের খাতিরে অপদার্থ জামাই করার অপবাদ তো তাঁহার মিটিবেই, চাই কি ঈশ্বর মুখ তুলিয়া চাহিলে ওই বিলাত-ফেরত জামাইয়ের জোরেই শেষ বয়সে একটা শাঁসালো গোছের খেতাব লইয়া মরিতে পারিবেন। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে গিয়া বলিলেন, হুজুর, আপাতত তো আমার হাতে কোন কাজ নেই, যা মিস্টার আইড্লের বহুমুখী প্রতিভার উপযোগী হতে পারে। তবে ভাবছি, জামাইটিকে আপনাদের 'হোমে' পাঠাব। মিঃ আইড্ল যদি অনুগ্রহ ক'রে তাকে একটু একটু ইংরেজী শিক্ষা দেন এবং ভারতবর্ষীয় অসভ্যতা ছাড়িয়ে আদব-কায়দায় একটু তালিম দেন তো মস্ত একটা উপকার হয়। আপনারা রাজার জাত, আমি আর কি প্রতিদান দিতে পারি? তাঁকে আমার বাগানবাড়িটা ছেড়ে দোব; পান তো খান না—সিগারেট খাবার জন্যে মাসে শ-তিনেক ক'রে দোব; একটা মোটর-গাড়ি চব্বিশ ঘণ্টা তাঁর অধীনে থাকবে; আর—আর চণ্ডীমণ্ডপটা পরিষ্কার ক'রে রাখব, শ্বেত পাথর দিয়ে বাঁধানো আছে, ইচ্ছে হ'লে স্কেটিং খেলবেন। হতভাগা বাংলা দেশে বরফ জমে না—এসে পর্য্যন্ত তাঁর স্কেটিঙের কত অসুবিধেই না হচ্ছে! উচ্ছন্ন যাক এমন দেশ।

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব বলিলেন যে, রায় সাহেবের বন্ধুত্বই তাঁহার পরম মূল্যবান সামগ্রী—তিনি তাঁহার কোন প্রস্তাবেই আপত্তি করিতে পারেন

না, এবং আশা করেন, তাঁহার শ্যালক মিঃ আইড্‌লও তাঁহার খাতিরে সম্মত হইবেন। তবে যেমন সিগারেট খাইবার জন্য রায় সাহেব তিন শত দিবেন বলিয়াছেন, সেই সঙ্গে খানা প্রভৃতির জন্যও যদি আরও শ খানেক ধরিয়া দেন তো মিঃ আইড্‌লকে রাজি করা সহজ হইয়া পড়িবে।

রায় সায়েব এটা তাঁহার পরম সৌভাগ্য মানিয়া লইলেন। আসিবার সময় শেক্‌হ্যাণ্ডের পর গোটা দুই-তিন আভূমি দীর্ঘ সেলাম ঠুকিয়া বলিয়া আসিলেন, হুজুর, গোলাম বার্থ-ডে অনার্স-লিস্টে এবার একেবারেই বাদ প'ড়ে গেল। সামনে নতুন বছরে খেতাব-বিতরণ আসছে—আপনারই হাতে সব।

রসিকের তালিম শুরু হইল। শ্বশুর বলিলেন, বাবাজী, একটু তাড়াতাড়ি সাহেবের কাছে কিছু ইংরেজী লেখাপড়া আদায় ক'রে নাও। যত শিগগির নিজের কাজ গুছিয়ে নিজেকে বিলেত যাবার যুগ্যি ক'রে নিতে পার, ততই ভাল। অন্য মাস্টার রাখলেও চলত, একটা খাতিরে প'ড়ে মাস গেলে এই পাঁচশো টাকার ধাক্কায় প'ড়ে গেছি।

রসিকের বিশেষ তাড়াতাড়ি ছিল না। সমস্ত রাত নববধূর সঙ্গে কাব্যচর্চ্চা করে, সমস্ত দিন ধরিয়া বধূটি ঘুমাইয়া কাটায় আর বরটি শিক্ষকের কাছে বসিয়া ঢোলে। শিক্ষক বিলাতের নূতন উৎসাহ লইয়া দিনকতক খুব চেষ্টা করিল। ছাত্রকে ইংরেজী শিক্ষা দিবার সুবিধার জন্য নিজে খানিকটা বাংলাও শিখিয়া ফেলিল। কিছুই ফল হইল না। তখন সে আরামকেদারায় পা তুলিয়া দিয়া অবিচ্ছিন্নভাবে সিগারেট টানিতে শুরু করিয়া দিল। মনে হইল, যেন তিনশো টাকার শেষ আধলাটি পর্য্যন্ত ধুঁয়ায় পরিণত করিয়া উড়াইয়া দিবে।

কথাটা যখন জানাজানি হইয়া গেল, রসিক-দম্পতিকে বিভক্ত

করিয়া আলাদা আলাদা দুই ঘরে জায়গা করিয়া দেওয়া হইল। বধূটির বড় লজ্জা ও একটু দুঃখ হইল, এবং রসিকের হইল রাগ। কয়েকদিন পরে যখন ওর লজ্জার জড়তা এবং এর রাগের বেগ অনেকটা কাটিয়া গেল, তখন গোপনে পত্রাচার আরম্ভ হইল। তাহাতে আমাদের ঘরোয়া আটপৌরে প্রেমের হা-হুতাশ বড় থাকিত না,—এদিক হইতে থাকিত বই-থেকে-তোলা পৃথ্বীরাজের বীরোচ্ছ্বাস, আর ও-তরফে ক্ষত্রিয়কুমারী সংযুক্তার অগ্নিময়ী বাণী।

এও একদিন অন্তঃপুরের গোয়েন্দাদের হাতে পড়িয়া গেল। শ্বশুর ভাবিলেন, এ তো ভ্যালা বিপদে পড়া গেল! রসিককে ডাকিয়া বলিলেন, বাবাজী, আমি বলছিলাম, তুমি গিয়ে না হয় বাগানবাড়ির এক ধারে সাহেবের সঙ্গে থেকে বিদ্যা অর্জ্জন কর—এইটিই আমাদের সেই ঋষিমুনিদের আমলের সনাতন প্রথা কিনা।

রসিক মুখ গোঁজ করিয়া বাগানবাড়িতে উঠিল এবং সেই দিনই তাহার নিজের সনাতন প্রথায় প্রথমে সাহেবের খানসামা ও পরে খোদ সাহেবের সহিত বিবাদ করিয়া একটা রীতিমত ফ্যাসাদ বাধাইয়া অন্তর্দ্ধান হইল। তাহার মানে, সেখানে অন্তর্দ্ধান হইয়া স্বগৃহে আসিয়া আবির্ভূত হইল।

পিতা আগুন হইয়া উঠিলেন, বলিলেন, এক্ষুনি বেরুক ও বাড়ি থেকে, কার হুকুমে আবার বাড়িতে এসে ঢুকেছে?

মেয়েরা সব রসিককে ঘিরিয়া কাঁদিতে লাগিল। ঠাকুরমা রসিককে বুকে চাপিয়া চক্ষের জলে স্নান করাইয়া বলিলেন, ষাট, বাছা আমার! জেলার মাচিষ্টকের শালাকে একটু চটিয়ে ফেলেছে; যদি বুদ্ধি ক'রে ঘরে না পালিয়ে আসত তো এতক্ষণ যে হাজতে গিয়ে উঠত,—আমার

সে কথা ভাবতেও যে গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। আজ তিনি বেঁচে থাকলে কি তোরা এমন কথা বলতে পারতিস?

দরদীদের দলের মধ্যে পড়িয়া রসিকেরও চক্ষু ডবডব করিয়া উঠিয়াছিল; ঠাকুরদার উল্লেখে চাপা আবেগে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, ঠাকুদ্দা বেঁচে থাকলে? ঠাকুদ্দা বেঁচে থাকলে আজ শ্বশুর বেটার সঙ্গেও একটা এসপার কি ওসপার ক'রে আসতাম—হ্যাঁ।

অবশ্য 'এসপার কি ওসপার' কিছু একটা হয় নাই বলিয়া রসিকের নিরাশ হইবার কোন কারণ ছিল না। শ্বশুরবাড়িতে হুলস্থূল এবং ক্রমে সারা জেলাতেই একটা চাঞ্চল্য পড়িয়া গেল। জেলার চুনোপুঁটি হইতে আরম্ভ করিয়া জজ ম্যাজিস্ট্রেট পর্য্যন্ত যত সাহেব ছিল, সকলের নিকট দরবার করিয়া রায় সাহেবের পায়ের সুতা ছিঁড়িল। শেষকালে আইড্‌ল সাহেবকে চার হাজার টাকার ক্ষতিপূরণ দিয়া ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের বিরাগ এবং খেতাবের উপর ফাঁড়াটা কাটাইয়া দিলেন। টাকাটা গনিয়া দিয়া বাড়িতে আসিয়া বলিলেন, আজ থেকে অমলি বিধবা হ'ল। কেউ যেন আমার সামনে জামাইয়ের নাম পর্য্যন্ত না মুখে আনে।

দিন দুই-তিন পরে কুটুম্বিতা বজায় রাখিবার জন্য রসিকের পিতা পুত্রের আচরণের জন্য ক্ষমাপ্রার্থী হইয়া একখানি পত্র লোক মারফৎ পাঠাইয়া দিলেন। লোকটা উত্তম-মধ্যম কয়েক ঘা খাইয়া গালি দিতে দিতে ফিরিয়া আসিল, বলিল, বললে—আমার মেয়েও নেই, জামাইও নেই—নিকালো হিঁয়াসে—নিকালো। ওঃ, সে কি গর্জ্জন! তারপরেই এই চোরের মার কর্ত্তামশায়।

সকলে ক্ষুব্ধ ও চিন্তিত হইয়া পড়িল। শুধু ঠাকুরমা 'তিনি বাঁচিয়া থাকিলে' এ অবস্থায় কি করিতেন নির্ণয় করিয়া সমস্যাটা সমাধান করিয়া

দিলেন, কহিলেন, মিন্সের নাকের ওপরে ছেলের বিয়ে দাও; কুলীনের ছেলের আবার বিয়ের ভাবনা কি গা? কি দাদা, বিয়ে করবি তো?

রসিক, বউ যে কি বস্তু খানিকটা স্বাদ পাইয়াছিল, একটু হাসিয়া ঘাড়টা কাত করিয়া জানাইল, সে খুব রাজি। পেসাদী ঘটকিনীর দেমাকী চালে বাড়িটা আবার টলমল করিতে লাগিল।

রসিক কিন্তু নিজের অন্তরকে ভুল বুঝিয়াছিল। দুরন্ত হাঁদাগোবিন্দ-গোছের ছেলে,—কিই বা সে অন্তরের মত সূক্ষ্ম জিনিসের খোঁজ রাখে? যে ভাবটা যখন মনের উপর স্পষ্ট হইয়া উঠে, সেইটার উপর তাহার বলিষ্ঠ দেহের সমস্ত শক্তি উৎসর্গ করিয়া দেওয়াই তাহার ধর্ম্ম। নূতন যখন বিরহ হইল, সে দেখিল, বউ নামক একটা বিস্তর সুবিধাজনক পদার্থের অভাব ঘটিয়াছে। তাই ঘাড়টা বাঁকাইয়া একেবারে কাঁধের উপর ফেলিয়া জানাইল, হাঁ, বিবাহ করিবে বইকি। এবং তাহার দাম্পত্য-জীবনে নানান ঝঞ্ঝাট বাধাইত এমন সব অপ্রয়োজনীয় কি অল্প-প্রয়োজনীয় লোকদের লক্ষ্য করিয়া বলিল, কিন্তু দেখ ঠাকুমা, এ শ্বশুরবাড়িতে যেন মেলা কেউ না থাকে—এই শালী-শালাজ এরা সব।

কিন্তু কথা হইতেছে যে, দাম্পত্যের দেবতাটি ক্রমাগত মারপ্যাচের মধ্য দিয়াই নিজের অধিকারটি সাব্যস্ত করিয়া যান, সুতরাং তিনি যে রসিক এবং রসিকের পিতা মাতা ঠাকুরমা প্রভৃতির সুবিধার জন্য রসিকের মনে আগাগোড়া একটা ভাবই কায়েম করিয়া রাখিবেন, এমন আশা করা নিতান্তই ভুল। সেইজন্য, যখন বিবাহের কথাটা বেশ পাকা হইয়া আসিয়াছে, এমন সময়টিতে রসিকের মনে এই কথাটা স্পষ্ট হইয়া উঠিল যে, বধূমাত্র হইলেই তাহার চলিবে না; তাহার অমলাকেই চাই, বিশেষ করিয়া—নিতান্তই। এতদিন শুধু বধূর অভাব

ছিল—একটা শূন্যতা মাত্র। আজ দেখিল, অভাবটা আসলে অমলার অভাব—শূন্যতাটাও বেদনায় ভরিয়া উঠিল, যাহা তাহার পক্ষে একেবারেই নূতন।

প্রথমে ভালমানুষের মত একটু ওজর-আপত্তি করিল। লোকে বলিল, তবু ভাল। ঠাকুরমা বলিলেন, একটু লজ্জা হয়েছে আর কি, ওটা কেটে যাবে 'খন। এক কথাতেই রাজি হয়েছিল ব'লে ও কি আমার তেমনই বেহায়া গা!

গায়ে-হলুদের দিন রসিক একেবারেই বাঁকিয়া বসিল। যখন তাহাকে অত্যধিক প্ররোচনা এবং ভয়প্রদর্শনের দ্বারা সোজা করিবার চেষ্টা করা হইল, সে গায়ে-হলুদের সমস্ত সরঞ্জাম ফেলিয়া ছড়াইয়া ভাঙিয়া চুরিয়া বেগে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল। কর্ত্তার গর্জ্জনের সঙ্গে মেয়েদের কান্না মিলিয়া উৎসবের বাড়িতে একটা বীভৎস কাণ্ড হইয়া দাঁড়াইল।

ঠাকুরমা নাতনী এবং নাতবউদের একত্র করিয়া আঁচলে চোখের জল মুছিতে মুছিতে বলিলেন, আমি ওর এতটুকু বয়স থেকেই ব'লে আসছি, ও ঠিক তোদের ঠাকুদ্দার মত হবে; তাঁর ছিল বটে ছ-ছটা বিয়ে—কি করবেন, কুলীনের ছেলে—কিন্তু এই পেরথোমটার ওপরই যে কি পোড়া টান ছিল!

৪

একটা নির্জ্জন জায়গা বাছিয়া রসিক একখানা চিঠি পড়িতেছিল, মাখন আসিয়া নিঃশব্দে পাশে বসিল। বলিল, চৌধুরীরা খুব গাল পাড়ছে।

রসিক চিঠি হইতে মুখ তুলিয়া প্রশ্নের ভাবে মাখনের দিকে চাহিল। সে সংক্ষেপে বলিল, কাল নষ্টচন্দ্র ছিল কিনা।

ওঃ, মনেই ছিল না, কাল বিকেলে এই চিঠিটা পেলাম কিনা। এ বছরটা আমার ফাঁকই গেল। কি কি লোকসান করলি?

দু কাঁদি কলা, একটা ফলুন্তে কুমড়ো-গাছ আর পাতকুয়োয় কেরাসিন তেল।

মন্দ হয় নি; ওদের অনেকগুলো কাঁচা ইটও পোড়াবার জন্যে সাজানো রয়েছে—যাক, আমার আর এ বছর মনেই ছিল না। বউ একটা চিঠি দিয়েছে, শোন্—'প্রিয়তম প্রাণেশ্বর'—বেশ বাংলা জানে, না?

মাখন ঘাড় নাড়িল।

'প্রিয়তম প্রাণেশ্বর

তুমি গিয়েছ পর্য্যন্ত আমার যে কি কষ্টেই কাটছে তা অন্তর্যামীই জানেন। দাসীকে কি এমনি ক'রেই পায়ে ঠেলে যেতে হয়? কোন্ গুরু অপরাধে অপরাধিনী আমি? কত জন্মের পুণ্যের ফলে তোমা হেন পতি লাভ করিলাম, কিন্তু কি পাপে আমি সে ধনে বঞ্চিত হলাম? আমার প্রাণে অহরহই বিরহের আগুন জ্বলছে, কিন্তু সে আগুন নিবুবার কেউ নেই—বোন ভাজ আর ছোট ভাইয়েরা সবাই বৈরী, খালি চিঠি লিখছি কি না ভেতরে ভেতরে সেই সন্ধান। আমি তো এ চিঠি বাটী হইতে লিখিতেছি না, অখিলদার বাটী হইতে। অখিলদার বউয়ের সঙ্গে খুব ভাব হইয়াছে। নাম শরৎকুমারী। তুমিও তারই ঠিকানায় চিঠি দিও আমায়, সে আমায় দিয়ে দেবে। বাড়ির ঠিকানায় কখনও চিঠি দিও না। আমরা দুজনে মিলে আজকাল 'পৃথ্বীরাজ' পড়ছি। আমার অনেক মুখস্থ হইয়া গিয়াছে।

অখিলদার বউ বলে—অখিলদা নাকি বলেন, তুমি খুব সাহসী বীরপুরুষ। অখিলদা নিজে বড্ড স্বদেশী কিনা। কিন্তু হায় পোড়া অদৃষ্ট আমার, আমি বীরজায়া হইতে পারিলাম না; মনের সাধ মনে রহিয়া গেল, পিতা বিমুখ, বিধি বাম। এ পিতৃগৃহ আমার পক্ষে কারাগার হয়ে পড়েছে। হায় স্বামিন্, পৃথ্বীরাজ যেমন সংযুক্তাকে বীরদর্পে তাঁহার পিতৃগৃহ হইতে উদ্ধার করিয়া নিজের শৌর্য্যবীর্য্যের পরিচয় দিয়া বিশ্বজগৎকে স্তম্ভিত করিয়াছিলেন, তুমি কি আমায় সেইরূপ করিবে না?

তা বলে তুমি যেন সত্যিসত্যি অমন কিছু করতে যেও না বাপু, হ্যাঁ। আমার বড্ড ভয় করে। যেদিন অমন মারধোর ক'রে চ'লে গেলে সেদিন আমার যে কি ভয় করেছিল।

শ্রীচরণে শতকোটি প্রণাম নিও। এখন তবে ৮০

ইতি

তোমার শ্রীচরণের জন্মজন্মের দাসী
শ্রীমতী অমলাবালা দেবী'

বেশ হয় কিন্তু তা হ'লে, না?

কি?

এই পৃথ্বীরাজের মত শ্বশুরবাড়ি থেকে কেড়ে নিয়ে আসা।

হুঁ।

কিন্তু ঘোড়া পাব কোথায়?

আমার বাবা যেটাতে চ'ড়ে রুগী দেখতে যান, তাতে হবে না? বাবা তো বাতে ভুগছেন।

দূর, তার হাঁটুতে হাঁটুতে ঠেকাঠেকি হয়, শেষকালে তাড়া খেয়ে

পৃথ্বীরাজ সংযুক্তা হুড়মুড় ক'রে প'ড়ে মরব? তা ছাড়া চড়বার পর তার রাশ ধ'রে খানিকটা টেনে নিয়ে যেতে হয়, তবে চলে।

তা বটে, তবে দুজনের জায়গা বেশ হ'ত; পেটটা বেশ মোটা আছে, আর পিঠটা খুব নীচু।

আমি একটা উত্তর লিখেছি। নে, পড়্ দিকিন, পরের মুখে শুনি, কি রকম হ'ল! তোদের ঘোড়ার কথাও আছে।

মাখন পড়িতে লাগিল—'প্রিয়তমা প্রাণেশ্বরী অমলাবালা আমার শতসহস্র চুম্বন গ্রহণ কর—'

রসিক টীকা করিল, দূর থেকে তা হয় না বটে; কিন্তু আমার পিসতুতো মেজদাকে গোড়াতেই ওই রকম লিখতে দেখেছি। মরুকগে, পড়্।

'আমাকে বীর ব'লে লজ্জা দিও না, তবে সেদিন আরও অনেককে ঠেঙাবার ইচ্ছে ছিল। আমার সঙ্গে যদি মাখন থাকত তো দেখতে। তাকে তুমি চেন না।'

রসিক বলিল, তোর কথাও লিখে দিলাম।

'আগে বেশ ছিল। সবাইকে মেরে ধ'রে যুদ্ধ ক'রে বিয়ে ক'রে আনত। তাতে শ্বশুরবাড়িতে জ্বালাতন করবার লোকও অনেক ক'মে যেত। কিন্তু আজকাল অন্য রকম হয়ে গেছে। সে রামও নেই, সে অযোধ্যাও নেই। তা না থাকৃগে। বাবা বলেন, নিজের বউ নিজের ঘরে নিয়ে আসব, তাতে আদালত আমার দিকে। সেখানে রায়-সাহেবী খাটবে না, হ্যাঁ বাবা। তোমার যেমন সংযুক্তার মত হতে সাধ যায়, আমারও ঠিক তেমনি পৃথ্বীরাজের মত তোমায় নিয়ে অশ্বারোহণে বীরদর্পে মেদিনী কম্পিত করিয়া পালিয়ে আসতে ইচ্ছে করে। কিন্তু কোন সুবিধে নেই। মাখনের বাবার একটা ঘোড়া

আছে। তার পিঠে চড়লেই কিন্তু সামনে পা দুটো বাড়িয়ে দিয়ে পেছনে হটতে আরম্ভ করে। তখন জিব দিয়ে টকাস টকাস ক'রে এক রকম শব্দ করতে হয়, তা আমার ভাল আসে না।

আচ্ছা অমলা, আমি যদি একটা ভাল ঘোড়া যোগাড় করি তো আমার সঙ্গে পালিয়ে আসবে তো? আগেকার মেয়েরা আগুনে পুড়ে মরত, আর তুমি এইটুকু পারবে না? বাবা আমার আর একটা বিয়ে দিচ্ছিলেন, আমি করি নি। আমি তোমায় ভয়ানক ভালবাসি। আমারও বিরহানলে বড্ড কষ্ট হচ্ছে। ঠাকুমা খালি মাঝে মাঝে সান্ত্বনা দেন। শীঘ্র পত্র দিবে। আমার চিত্তচকোর বড় ব্যাকুল হইয়াছে।

ইতি
জন্ম জন্ম তোমারই
রসিকলাল'

রসিক আবার একটু টীকা করিল, চিত্তচকোর এক রকম পাখি—শেষকালে ওই রকম লিখতে হয়। বেশ হয় নি লেখাটা?

মাখন বলিল, হুঁ।

তাহার পরদিন বেশ করিয়া এসেন্স মাখাইয়া পত্রখানি ডাকে দিয়া দুই তিন-দিন অতীত হইতেই রসিক গিয়া পোস্ট-আপিসে হাজিরা দিতে লাগিল। মাসখানেক নিয়মিতভাবে গেল, কিন্তু কোন উত্তর আসিল না। তখন নিরাশ হইয়া দিনকতক যাওয়াই ছাড়িয়া দিল; তাহার পর আবার আশায় বুক বাঁধিল। এই রকম করিয়া আশা-নিরাশার দ্বন্দ্বের মধ্যে অনেকদিন কাটিয়া গেল—দুই মাস, চার মাস, পাঁচ মাস কাটিয়া গেল—কোন উত্তরই নাই। রসিকও ক্রমাগতই বধূকে উদ্দেশ্য করিয়া মাখনের কাছে বলিতে লাগিল, আর এক মাস—আর পনরো দিন—

আর এক সপ্তাহ দেখব, তারপর ধাঁ ক'রে বিয়ে ক'রে বসব, এই তোকে ব'লে রাখলাম মাখন।

ঠাকুরমা তাহার পিতাকে তাগাদা করিতে লাগিলেন, ছেলে যে এদিকে কালি হয়ে গেল, একটা হেস্তনেস্ত কিছু কর্।

তিনি বেহাইকে তিন-চারখানা পত্র দিলেন, প্রথমে খুব মিনতির ভাব, ক্রমে ক্রোধ এবং পরে কন্যার উপর নিজের দাবি সাব্যস্ত করিয়া। কোন জবাবই আসিল না।

রসিক শেষকালে হার মানিয়া একদিন মাখনের সঙ্গে পরামর্শ করিতেছিল—তাহাকে মালিনী সাজাইয়া কিংবা ভিখারী-বালক সাজাইয়া বধূসকাশে কি করিয়া পাঠানো যায়, এমন সময় তাহার ছোট বোন হাতে একটা চিঠি লইয়া আসিয়া বলিল, বকশিশ দাও।

রসিক আগ্রহভরে তিন-চার বার চাহিল, তাহার পর পুরস্কারস্বরূপ তাহার গালে একটা প্রচণ্ড চড় বসাইয়া চিঠিটা কাড়িয়া লইল।

লেখা ছিল—

'জীবিতেশ,

কোথা হইতে পত্র দিতেছি, তুমি স্বপ্নেও ভাবিতে পারিবে না। তোমার প্রেমাবেগপূর্ণ পত্র যথাসময়ে পাইয়াছিলাম। আমার সেই হৃদয়ের নিধিকে সযতনে বাক্সে বন্ধ ক'রে রেখেছিলাম। তিন দিন ছিল। তারপর চুরি যায়। তাহার পর বাড়িতে হৈ-হৈ পড়ে যায়। তোমার সুধামাখা লিপিখানিতে ঘোড়া, পৃথ্বীরাজ আর পালাবার কথা ছিল কিনা, সেই হোলো কাল। বাবা বললেন, ভ্যালা পাপ তো, এটারও মাথা খেয়েছে! স্থির হোলো, আমি গিয়ে মামার বাড়ি থাকব। এখানে ছুকোশের মধ্যে পোষ্টাপিস নেই আর কড়া পাহারা। আমার কাগজ কালি কলম টিকিট সব কেড়ে নিয়ে একবস্ত্রা ক'রে এই দ্বীপান্তরে

দিয়েছেন। সবাই বলে, তবে অমন ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিতে গেলেন কেন বাপু? আমি মনে মনে বলি, তোমরা সে যে কি ধন কি ক'রে জানবে? হায় নাথ, এই পাঁচ মাস তেরো দিন যে কি নরকযন্ত্রণা ভোগ করছি, কে সেই অন্তরের গূঢ় মর্ম্মবেদনা বুঝিবে; তোমার জন্যে প্রাণ সর্ব্বদাই হু-হু করিতে থাকে। শেষকালে আজ পাঁচ মাস তেরো দিন পরে আমার মামাতো বোন শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছে দেখে তাহার হাতে পায়ে ধ'রে এই চিঠিখানা ফেলে দিতে বললাম। তার মত ধরাধামে আজ সুখী কে? আমারও ইচ্ছে হচ্ছে, আজ লজ্জা-সরম মান-অপমান জলাঞ্জলি দিয়ে তোমার কাছে ছুটে যাই। নারীর হৃদয় তুমি কি বুঝিবে সখে?

বাবা নূতন বছরে কোন খেতাব পান নি ব'লে তোমার ওপর ভারি চ'টে আছেন। বার্থ ডে লিষ্টের আশায় আশায় আছেন। এই ঝোঁকই হয়েছে কাল, কি যে লাভ এতে? এই সবের জন্যে সাহেবদের এবার একটা মস্ত ভোজ দেবেন ইংরিজী মাসের তেরো তারিখে, শনিবার। খুব ঘটা হবে। আমায় শুনছি দিনকতকের জন্যে সেই উপলক্ষে নিয়ে যাবেন। অহো, এইটে যদি আমার স্বয়ম্বর-সভা হোত, আর পৃথ্বীরাজের মত বাবা তোমার একটা মূর্ত্তি গ'ড়ে দারোয়ান ক'রে বাইরে দাঁড় করিয়ে রাখতেন, আর অমনি আমি মালা নিয়ে সভার আর কারোর দিকে না চেয়ে সটাং গিয়ে তোমার মূর্ত্তির গলায় মালা দিয়ে দিতাম আর অমনি হৈ-হৈ প'ড়ে যেত, আর তুমি হঠাৎ কোথা থেকে এসে আমায় ঘোড়ায় তুলে নিয়ে পালাতে! আজকাল ঘোড়ার চেয়ে মটরে ঢের সুবিধে। না বাপু, তোমায় এসব লিখতে সাহস হয় না। একটা কাণ্ড ক'রে বসবে আবার। তবে বড্ড দেখতে ইচ্ছে করে। একবার কি এখানে আসতে পারবে না? আমি সেই দিন আমাদের পশ্চিম দিকের

খিড়কির দরজার কাছে রাত সাড়ে সাতটার সময় দাঁড়িয়ে থাকব। অন্ধকার রাত্রি। বাড়ির আর সবাই তামাসা দেখবে, আমি একটা ছুতো ক'রে ওই দিকে স'রে পড়ব। দোহাই তোমার, একবার এসো, শুধু একবারটি। এসো, এসো, এসো, এই তিন বার বলছি। আবার তো সবাই আমায় এই বনবাসে দেবেই।

তুমি চিঠির গোড়ায় শত সহস্র যে জিনিসের কথা লিখেছিলে তা আমারও ইচ্ছে হয়, কিন্তু লিখতে বড় লজ্জা করে, যাও। যদি আস তো যত চাও দোব। কেউ যেন টের না পায়। আমার কোটি কোটি প্রণাম নিও। এখন তবে ৮০

ইতি তোমার শ্রীচরণের জন্মজন্মের দাসী
শ্রীমতী অমলাবালা দেবী'

রসিক অনেকক্ষণ মৌনভাবে কি চিন্তা করিতে লাগিল, তাহার পর অকস্মাৎ প্রশ্ন করিল, আজ ক তারিখ রে?

মাখন হিসাব করিয়া বলিল, তরশু মাইনে দিয়েছি—সাত তারিখে; আট, নয়, আজ দশ তারিখ।

রসিক আরও নিবিষ্ট মনে খানিকটা ভাবিল, তাহার পর বলিল, ও মেয়েমানুষ, কি বুঝবে? ঘোড়া হ'লে খুব মানাত, খটাখট খটাখট ক'রে দুজনে এক ঘোড়ার পিঠে চ'ড়ে ছুটেছি—সে এক দেখতেই।

আর একটু পরে বলিল, মোটর চালাতেও আমার খুব অভ্যেস হয়ে গেছে—শ্বশুর-বাড়িতে ওই কাজই করতাম কিনা সমস্ত দিন। মোটরের কথা তোর আমার মাথায়ই ঢোকে নি; বউ মেয়েমানুষ হ'লেও কি রকম বুদ্ধি দেখেছিস?

দুইটি হাঁটুর উপর থুঁতনিটা চাপিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তাহার পর হঠাৎ উৎসাহভরে দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, হয়েছে রে,

যাব ; একটা অ্যায়সা মতলব এঁটেছি। তোকে বলব 'খন—কাল বিকেলে—সেইখানে।

তেরো তারিখের সন্ধ্যা উতরাইয়া গিয়া বেশ গা-ঢাকা-গোছের অন্ধকার হইয়াছে। সাঙ্কেতিক পশ্চিম-দরজার কাছে গিয়া রসিক দাঁড়াইল। সমস্ত লোক উৎসবের দিকে, এদিকটায় একেবারে কেহ নাই।

দরজা খুলিয়া রঙিন কাপড় পরা একটি কিশোরী মূর্ত্তি উঁকি মারিয়া আবার দরজাটা একটু ভেজাইয়া দিল। রসিক আরও খানিক অগ্রসর হইয়া বলিল, এস, এসেছি।

কিশোরী বাহির হইয়া আসিল। চোখোচোখি হইতেই রসিক হাসিয়া ফেলিল। মেয়েটি কিন্তু চোখ নত করিল এবং একটু পরে তাহার বুকটা ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল ও চাপা কান্নার আওয়াজ হইতে লাগিল।

রসিক বলিল, তবে চললাম ; এইজন্যে আমি মেয়েমানুষকে দুচক্ষে দেখতে পারি না।

মেয়েটি ফোঁপানোর মধ্যে বলিল, কি বলছ ?

মামার বাড়ি বড়, না শ্বশুরবাড়ি বড় ?

শ্বশুরবাড়ি।

তা হ'লে এগিয়ে এস। মোটর ঠিক ক'রে রেখেছি। ড্রাইভার বেটা তামাশা দেখছে। দেরি ক'রো না, ভেস্তে যাবে।

মেয়েটি এইবার ভীতভাবে মুখের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

রসিক কোমর হইতে একটা ঝকঝকে ছোরা বাহির করিল, বলিল, তা হ'লে এই দেখ, তোমার সামনে নিজের বুকে আমূল বসিয়ে দোব। আর ভূত হয়ে ওদিক গিয়ে একটা এসপার কি ওসপার ক'রে ছাড়ব।

বধূটি ভয়মুগ্ধভাবে চাহিয়া পা বাড়াইল। রসিক তাহার হাতটা ধরিলে দুইজনে খুব সন্তর্পণে মোটরে আসিয়া উঠিল, এবং এতক্ষণ পরে বধূকে একটা চুম্বন করিয়া মোটর ছাড়িয়া দিল। বলিল, ভয়, নেই, আমায় জড়িয়ে ব'স।

যেখানে উৎসব হইতেছিল, তাহার সামনে দিয়াই রাস্তা। রসিক গলা বাড়াইয়া চেঁচাইয়া বলিল, চললাম নিয়ে।

প্রথমটা সবাই হতভম্ব হইয়া গেল। পরমুহূর্ত্তে হৈ-হৈ পড়িয়া গেল। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব লক্ষ্য করিয়া দেখিয়া বলিয়া উঠিল, Oh my !—it's my car running away ! (সর্ব্বনাশ, এ যে দেখছি আমার গাড়ি ছুটে চলেছে!)

'ধর ধর' 'সাজ সাজ' রব পড়িয়া গেল। দুই-তিনটা ঘোড়া একখানা মোটরকার আর লোকের পাল ছুটিল, কিন্তু রসিককে তখন আর পায় কে? ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ মাইলের রাস্তা একদমে পার হইয়া একেবারে বাড়ির দরজার সামনে আসিয়া দাঁড়াইল এবং নিজে বাড়ির মধ্যে হনহন করিয়া ঢুকিয়া একটা ঘরে খিল দিয়া ভিতর হইতে বলিল, ওই এনে দিয়েছি সদর-দোরে, দেখগে সব।

রাণুর প্রথম ভাগ

১

আমার ভাইঝি রাণুর প্রথম ভাগের গণ্ডি পার হওয়া আর হইয়া উঠিল না।

তাহার সহস্রবিধ অন্তরায়ের মধ্যে দুইটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য,—এক, তাহার প্রকৃতিগত অকালপক্ক গিন্নীপনা, আর অন্যটি, তাহার আকাশচুম্বী উচ্চাকাঙ্ক্ষা। তাহার দৈনিক জীবনপ্রণালী লক্ষ্য করিলে মনে হয়, বিধাতা যদি তাহাকে একেবারে তাহার ঠাকুরমার মত প্রবীণা গৃহিণী এবং কাকার মত এম. এ., বি. এল. করিয়া পাঠাইতেন, তাহা হইলে তাহাকে মানাইতও ভাল এবং সেও সন্তুষ্ট থাকিত। তাহার ত্রিশ-চল্লিশ বৎসর পরবর্ত্তী ভাবী নারীত্ব হঠাৎ কেমন করিয়া যেন ত্রিশ-চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে আসিয়া পড়িয়া তাহার ক্ষুদ্র শরীর-মনটিতে আর আঁটিয়া উঠিতেছে না—রাণুর কার্য্যকলাপ দেখিলে এই রকমই একটা ধারণা মনে উপস্থিত হয়। প্রথমত, শিশুসুলভ সমস্ত ব্যাপারেই তাহার ক্ষুদ্র নাসিকাটি তাচ্ছিল্যে কুঞ্চিত হইয়া উঠে—খেলাঘর সে মোটেই বরদাস্ত করিতে পারে না, ফ্রক জামাও না, এমন কি নোলক পরাও নয়। মুখটা গম্ভীর করিয়া বলে, আমার কি আর ও সবের বয়েস আছে মেজকা?

বলিতে হয়, না মা, আর কি—তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকল।

রাণু চতুর্থ কালের কাল্পনিক দুশ্চিন্তা-দুর্ভাবনায় মুখটা অন্ধকার করিয়া বসিয়া থাকে।

আর দ্বিতীয়ত—কতকটা বোধ হয় শৈশবের সহিত সম্পর্কিত

বলিয়াই—তাহার ঘোরতর বিতৃষ্ণা প্রথম ভাগে। দ্বিতীয় ভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া তাহার কাকার আইন-পুস্তক পর্য্যন্ত আর সবগুলির সহিতই তাহার বেশ সৌহার্দ্দ্য আছে, এবং তাহাদের সহিতই তাহার দৈনিক জীবনের অর্দ্ধেকটা সময় কাটিয়া যায় বটে, কিন্তু প্রথম ভাগের নামেই সমস্ত উৎসাহ একেবারে শিথিল হইয়া আসে। বেচারীর মলিন মুখখানি ভাবিয়া আমি মাঝে মাঝে এলাকাড়ি দিই—মনে করি, যাকগে বাপু, মেয়ে—নাই বা এখন থেকে বই স্লেট নিয়ে মুখ গুঁজড়ে রইল, ছেলে হওয়ার পাপটা তো করে নি ; নেহাতই দরকার বোধ করা যায়, আর একটু বড় হোক, তখন দেখা যাবে 'খন।

এই রকমে দিনগুলা রাণুর বেশ যায় ; তাহার গিন্নীপনা সতেজে চলিতে থাকে এবং পড়াশুনারও বিষম ধুম পড়িয়া যায়। বাড়ির নানা স্থানের অনেক-সব বই হঠাৎ স্থানভ্রষ্ট হইয়া কোথায় যে অদৃশ্য হয়, তাহার খোঁজ দুরূহ হইয়া উঠে এবং উপরের ঘর নীচের ঘর হইতে সময়-অসময়ে রাণুর উঁচু গলায় পড়ার আওয়াজ আসিতে থাকে—ঐ ক-য়ে য-ফলা ঐক্য, ম-য়ে আকার ণ-য়ে হস্বই ক-য়ে য-ফলা মাণিক্য, বা পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল, অথবা তাহার রাঙা কাকার আইন মুখস্থ করার ঢঙে—হোয়ার অ্যাজ ইট ইজ, ইত্যাদি।

আমার লাগে ভাল, কিন্তু রাণুর স্বাভাবিক স্ফূর্ত্তির এই রকম দিনগুলা বেশিদিন স্থায়ী হইতে পারে না। ভাল লাগে বলিয়াই আমার মতির হঠাৎ পরিবর্ত্তন হইয়া যায় এবং কর্ত্তব্যজ্ঞানটা সমস্ত লঘুতাকে ভ্রূভঙ্গী করিয়া প্রবীণ গুরুমহাশয়ের বেশে আমার মধ্যে জাঁকিয়া আসিয়া বসে। সনাতন যুক্তির সাহায্যে হৃদয়ের সমস্ত দুর্ব্বলতা নিরাকরণ করিয়া গুরুগম্ভীর স্বরে ডাক দিই, রাণু!

রাণু এ স্বরটি বিলক্ষণ চেনে ; উত্তর দেয় না। মুখটি কাঁদ-কাঁদ

করিয়া নিতান্ত অসহায় ভালমানুষের মত ধীরে ধীরে আসিয়া মাথা নীচু করিয়া দাঁড়ায়, আমার আওয়াজটা তাহার গলায় যেন একটা ফাঁস পরাইয়া টানিয়া আনিয়াছে। আমি কর্ত্তব্যবোধে আরও কড়া হইয়া উঠি, সংক্ষেপে বলি, প্রথম ভাগ। যাও।

ইহার পরে প্রতি বারই যদি নির্ব্বিবাদে প্রথম ভাগটি আসিয়া পড়িত এবং যেন তেন প্রকারেণ দুইটা শব্দও গিলাইয়া দেওয়া যাইত তো হাতেখড়ি হওয়া ইস্তক এই যে আড়াইটা বৎসর গেল, ইহার মধ্যে মেয়েটাও যে প্রথম ভাগের ও-কয়টা পাতা শেষ করিতে পারিত না, এমন নয়। কিন্তু আমার হুকুমটা ঠিকমত তামিল না হইয়া কতকগুলা জটিল ব্যাপারের সৃষ্টি করে মাত্র—যেমন, এরূপ ক্ষেত্রে কোন কোন বার দুই-তিন দিন পর্য্যন্ত রাণুর টিকিটি আর দেখা যায় না। সে যে কোথায় গেল, কখন আহার করিল, কোথায় শয়ন করিল, তাহার একটা সঠিক খবর পাওয়া যায় না। দুই-তিন দিন পরে হঠাৎ যখন নজরে পড়িল, তখন হয়তো সে তাহার ঠাকুরদাদার সঙ্গে চায়ের আয়োজনে মাতিয়া গিয়াছে, কিংবা তাঁহার সামনে প্রথম ভাগটাই খুলিয়া রাখিয়া তাহার কাকাদের পড়ার খরচ পাঠানো কিংবা আহার্য্য দ্রব্যের বর্ত্তমান দুর্ম্মূল্যতা প্রভৃতি সংসারের কোন একটা দুরূহ বিষয় লইয়া প্রবল বেগে জ্যাঠামি করিয়া যাইতেছে, অথবা তাঁহার বাগানের যোগাড়যন্ত্রের দক্ষিণহস্তস্বরূপ হইয়া সব বিষয়ে নিজের মন্তব্য দিতে দিতে সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। আমার দিকে হয়তো একটু আড়চোখে চাহিল, বিশেষ কোন ভয় বা উদ্বেগ নাই—জানে, এমন দুর্ভেদ্য দুর্গের মধ্যে আশ্রয় লইয়াছে, যেখানে সে কিছুকাল সম্পূর্ণ নির্ব্বিঘ্ন।

আমি হয়তো বলিলাম, কই রাণু, তোমায় না তিন দিন হ'ল বই আনতে বলা হয়েছিল?

সে আমার দিকে না চাহিয়া বাবার দিকে চায়, এবং তিনিই উত্তর দেন, ওহে, সে এক মহা মুশকিল ব্যাপার হয়েছে, ও বইটা যে কোথায় ফেলেছে—

রাণু চাপা স্বরে শুধরাইয়া দেয়, ফেলি নি—বল, কে যে চুরি ক'রে নিয়েছে—

হ্যাঁ, কে যে চুরি ক'রে নিয়েছে, বেচারী অনেকক্ষণ খুঁজেও—

রাণু যোগাইয়া দেয়, তিন দিন খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়েও—

হ্যাঁ, তোমার গিয়ে, তিন দিন হয়রান হয়েও—শেষে না পেয়ে হাল ছেড়ে—

রাণু ফিসফিস করিয়া বলিয়া দেয়, হাল ছাড়ি নি এখনও।

হ্যাঁ, ওর নাম কি হাল না ছেড়ে ক্রমাগত খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্ছে। যা হোক, একখানা বই আজ এনে দিও, কতই বা দাম!

রাগ ধরে, তুই বুঝি এই কাটারি হাতে ক'রে বাগানে বাগানে বই খুঁজে বেড়াচ্ছিস? লক্ষ্মীছাড়া মেয়ে।

কাতরভাবে বাবা বলেন, আহা, ওকে আর এ সামান্য ব্যাপারের জন্যে গালমন্দ করা কেন? এবার থেকে ঠিক ক'রে রাখবে তো গিন্নী?

রাণু খুব ঝুঁকাইয়া ঘাড় নাড়ে। আমি ফিরিয়া আসিতে আসিতে শুনিতে পাই, তোমায় অত ক'রে শেখাই, তবু একটুও মনে থাকে না দাদু। কি যেন হচ্ছ দিন দিন!

কখনও কখনও হুকুম করিবার খানিক পরেই বইটার আধখানা আনিয়া হাজির করিয়া সে খোকার উপর প্রবল তম্বি আরম্ভ করিয়া দেয়। তম্বিটা আসলে আরম্ভ হয় আমাকেই ঠেস দিয়া, তোমার আদুরে ভাইপোর কাজ দেখ মেজকা। লোকে আর পড়াশুনা করবে কোথা থেকে?

আমি বুঝি, কাহার কাজ। কটমট করিয়া চাহিয়া থাকি।

তুষ্টু ছুটিয়া গিয়া বামালসুদ্ধ খোকাকে হাজির করে—সে বোধ হয় তখন একখানা পাতা মুখে পুরিয়াছে এবং বাকিগুলার কি করিলে সবচেয়ে সদ্গতি হয়, সেই সম্বন্ধে গবেষণা করিতেছে। তাহাকে আমার সামনে ধপ করিয়া বসাইয়া রাণু রাগ দেখাইয়া বলে, পেত্যয় না যাও, দেখ। আচ্ছা, এ ছেলের কখনও বিয়ে হবে মেজকা ?

আমি তখন হয়তো বলি, ওর কাজ, না তুমি নিজে ছিঁড়েছ রাণু ? ঠিক আগেকার পাঁচখানি পাতা ছেঁড়া—যত বলি, তোমায় কিচ্ছু বলব না—খান তিরিশেক বই তো শেষ হ'ল !

ধরা পড়িয়া লজ্জা, ভয়, অপমানে নিশ্চল নির্ব্বাক হইয়া এমন ভাবে দাঁড়াইয়া থাকে যে, নেহাত নৃশংস না হইলে ইহার উপর আর কিছু তাহাকে বলা যায় না। তখনকার মত শাস্তির কথা ভুলিয়া তাহার মনের গ্লানিটুকু মুছাইয়া দিবার জন্য আমায় বলিতেই হয়, হ্যাঁরে তুষ্টু, দিদির বই ছিঁড়ে দিয়েছিস ? আর তুমিও তো ওকে একটু-আধটু শাসন করবে না রাণু। ওর আর কতটুকু বুদ্ধি, বল ?

চাঁদমুখখানি হইতে মেঘটা সরিয়া গিয়া হাসি ফোটে। তখন আমাদের তুইজনের মধ্য হইতে প্রথম ভাগের ব্যবধানটা একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যায় এবং রাণু দিব্য সহজভাবে তাহার গিন্নীপনার ভূমিকা আরম্ভ করিয়া দেয়। এই সময়টা সে হঠাৎ এত বড় হইয়া যায় যে, ছোট ভাইটি হইতে আরম্ভ করিয়া বাপ, খুড়া, ঠাকুরমা, এমন কি ঠাকুরদাদা পর্য্যন্ত সবাই তাহার কাছে নিতান্ত ক্ষুদ্র এবং স্নেহ ও করুণার পাত্র হইয়া পড়ে। এই রকম একটি প্রথম ভাগ ছেঁড়ার দিনে কথাটা এই ভাবে আরম্ভ হইল—কি ক'রে শাসন করব বল মেজকা ? আমার কি নিশ্বেস ফেলবার সময় আছে, খালি কাজ—কাজ—আর কাজ।

হাসি পাইলেও গম্ভীর হইয়া বলিলাম, তা বটে, কত দিক আর দেখবে?

যে দিকটা না দেখেছি, সেই দিকেই গোল—এই তো খোকার কাণ্ড চোখেই দেখলে। কেন রে বাপু, রাণু ছাড়া আর বাড়িতে কেউ নেই? খাবার বেলা তো অনেকগুলি মুখ; বল মেজকা! আচ্ছা, কাল তোমার ঝাল-তরকারিতে নুন ছিল?

বলিলাম, না, একেবারে মুখে দিতে পারি নি।

তার হেতু হচ্ছে, রাণু কাল রান্নাঘরে যেতে পারে নি।—ফুরসৎ ছিল না। এই তো সবার রান্নার ছিরি! আজ আর সে রকম কম হবে না, আমি নিজের হাতে দিয়ে এসেছি নুন।

আমার শখের ঝাল-তরকারি খাওয়া সম্বন্ধে নিরাশ হইয়া মনের দুঃখ মনে চাপিয়া বলিলাম, তুমি যদি রোজ একবার ক'রে দেখ মা।

গাল দুইটি অভিমানে ভারী হইয়া উঠিল, হবার জো নেই মেজকা, রাণু হয়েছে বাড়ির আতঙ্ক। 'ওরে, ওই বুঝি রাণু ভাঁড়ার-ঘরে ঢুকেছে—রাণু বুঝি মেয়েটাকে টেনে দুধ খাওয়াতে বসেছে, দেখ্ দেখ্—তোকে কে এত গিন্নীত্ব করতে বললে বাপু?' হ্যাঁ, মেজকা, এত বড়টা হলুম, দেখেছ কখনও আমায় গিন্নীত্ব করতে—কক্খনও—একরত্তিও?

বলিলাম, ব'লে দিলেই হ'ল একটা কথা, ওদের আর কি!

মুখটি বুজে শুনে যাই। একজন হয়তো বললেন, 'ওই বুঝি রাণু রান্নাঘরে সেঁধোল!' রাঙী বেড়ালটা বলে, আমি পদে আছি। কেউ চেঁচিয়ে উঠলেন, 'ওরে, রাণু বুঝি ওর বাপের—।' আচ্ছা মেজকা, বাবার ফুলদানিটা আমি ভেঙেছি ব'লে তোমার একটুও বিশ্বাস হয়?

এ ঘটনাটি সবচেয়ে নূতন; গিন্নীপনা করিয়া জল বদলাইতে গিয়া

রাণুই ফুলদানিটা চুরমার করিয়া দিয়াছে, ঘরে আর দ্বিতীয় কেহ ছিল না। আমি বলিলাম, কই, আমি তো ম'রে গেলেও এ কথা বিশ্বাস করতে পারি না।

ঠোঁট ফুলাইয়া রাণু বলিল, যার ঘটে একটুও বুদ্ধি আছে, সে করবে না। আমার কি দরকার মেজকা, ফুলদানিতে হাত দেবার? কেন, আমার নিজের পেরথোম ভাগ কি ছিল না যে বাবার ফুলদানি ঘাঁটতে যাব?

প্রথম ভাগের উপর দরদ দেখিয়া ভয়ানক হাসি পাইল, চাপিয়া রাখিয়া বলিলাম, মিছিমিছি দোষ দেওয়া ওদের কেমন একটা রোগ হয়ে পড়েছে।

দুষ্টু একটু মুখ নীচু করিয়া চুপ করিয়া রহিল; তাহার পর সুবিধা পাইয়া তাহার সদ্য দোষটুকু সম্পূর্ণরূপে স্খালন করিয়া লইবার জন্য আমার কোলে মুখ গুঁজিয়া আরও অভিমানের সুরে আস্তে আস্তে বলিল, তোমারও এ রোগটা একটু একটু আছে মেজকা;—এক্ষুনি বলছিলে, আমি পেরথোম ভাগটা ছিঁড়ে এনেছি।

মেয়ের কাছে হারিয়া গিয়া হাসিতে হাসিতে তাহার কেশের মধ্যে অঙ্গুলি-সঞ্চালন করিতে লাগিলাম।

২

বই হারানো, কি ছেঁড়া, পেট-কামড়ানো, মাথা-ব্যথা, খোকাকে ধরা প্রভৃতি ব্যাপারগুলা যখন অনেকদিন তাহাকে বাঁচাইবার পর নিতান্ত একঘেয়ে এবং শক্তিহীন হইয়া পড়ে, তখন দুই-এক দিনের জন্য নেহাত বাধ্য হইয়াই রাণু বই স্লেট লইয়া হাজির হয়। অবশ্য পড়াশুনা কিছুই

হয় না। প্রথমে গল্প জমাইবার চেষ্টা করে। সংসারের উপর কোন-কিছুর জন্য মনটা খিঁচড়াইয়া থাকায় কিংবা অন্য কোন কারণে যদি সকলের নিজ নিজ কর্ত্তব্য সম্বন্ধে আমার মনটা বেশি রকম সজাগ থাকে তো ধমক খাইয়া বই খোলে; তাহার পর পড়া আরম্ভ হয়। সেটা রাণুর পাঠাভ্যাস, কি আমার ধৈর্য্য, বাৎসল্য, সহিষ্ণুতা প্রভৃতি সদ্‌গুণের পরীক্ষা, তাহা স্থির করিয়া বলা কঠিন। আড়াইটি বৎসর গিয়াছে, ইহার মধ্যে রাণু 'অজ' 'আম'-র পাতা শেষ করিয়া 'অচল' 'অধম'-র পাতায় আসিয়া অচলা হইয়া বসিয়া আছে। বই খুলিয়া আমার দিকে চায়—অর্থাৎ বলিয়া দিতে হইবে। আমি প্রায়ই পড়াশুনার অত্যাবশ্যকতা সম্বন্ধে একটি ক্ষুদ্র উপদেশ দিয়া আরম্ভ করি, আচ্ছা রাণু, যদি পড়াশুনা না কর তো বিয়ে হ'লেই যখন শ্বশুরবাড়ি চ'লে যাবে, মেজকাকা কি রকম আছে, তাকে কেউ সকালবেলা চা দিয়ে যায় কি না, নাইবার সময় তেল কাপড় গামছা দিয়ে যায় কি না, অসুখ হ'লে কেউ মাথায় হাত বুলিয়ে দেয় কি না—এসব কি ক'রে খোঁজ নেবে?

রাণু তাহার মেজকাকার ভাবী দুর্দ্দশার কথা কল্পনা করিয়া একটু মৌন থাকে, কিন্তু বোধ হয় প্রথমভাগ-পারাবার পার হইবার কোন সম্ভাবনাই না দেখিয়া বলে, আচ্ছা মেজকা, একেবারে দ্বিতীয় ভাগ পড়লে হয় না? আমায় একটুও ব'লে দিতে হবে না। এই শোন না—ঐ ক-য়ে য-ফলা—

রাগিয়া বলি, ওই ডেঁপোমি ছাড় দিকিন, ওইজন্যেই তোমার কিছু হয় না। নাও, পড়। সেদিন কত দূর হয়েছিল? 'অচল' 'অধম' শেষ করেছিলে?

রাণু নিষ্প্রভভাবে ঘাড় নাড়িয়া জানায়, হাঁ।

বলি, পড় তা হ'লে একবার।

'অচল' কথাটার উপর কচি আঙুলটি দিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। আমার মাথার রক্ত গরম হইয়া উঠিতে থাকে এবং স্নেহ করুণা প্রভৃতি স্নিগ্ধ চিত্তবৃত্তিগুলা বাষ্প হইয়া উড়িয়া যাইবার উপক্রম হয়। মেজাজেরই বা আর দোষ দিই কি করিয়া? আজ এক বৎসর ধরিয়া এই 'অচল' 'অধম' লইয়া কসরৎ চলিতেছে; এখনও রোজই এই অবস্থা।

তবুও ক্রোধ দমন করিয়া গম্ভীরভাবে বলি, ছাই হয়েছে। আচ্ছা বল—অ—চ—আর ল—অচল।

রাণু অ-র উপর হইতে আঙুলটা না সরাইয়াই তিনটা অক্ষর পড়িয়া যায়। 'অধম'-ও ওই ভাবেই শেষ হয়; অথচ ঝাড়া দেড়টি বৎসর শুধু অক্ষর চেনায় গিয়াছিল।

তখন জিজ্ঞাসা করিতে হয়, কোন্‌টা অ?

রাণু ভীতভাবে আমার দিকে চাহিয়া আঙুলটি সরাইয়া ল-এর উপর রাখে।

ধৈর্য্যের সূত্রটা তখনও ধরিয়া থাকি, বলি, হুঁ, কোন্‌টা ল হ'ল তা হ'লে?

আঙুলটা সট করিয়া চ-এর উপর সরিয়া যায়। ধৈর্য্যসাধনা তখনও চলিতে থাকে; শান্তকণ্ঠে বলি, চমৎকার! আর চ?

খানিকক্ষণ স্থিরভাবে বইয়ের দিকে চাহিয়া থাকে, তাহার পর বলে, চ? চ নেই মেজকা।

সংযত রাগটা অত্যন্ত উগ্রভাবেই বাহির হইয়া পড়ে, পিঠে একটা চাপড় কষাইয়া বলি, তা থাকবে কেন? তোমার ডেঁপোমি দেখে চম্পট দিয়েছে। হতভাগা মেয়ে—রাজ্যের কথার জাহাজ হয়েছেন,

আর এদিকে আড়াই বৎসরে প্রথম ভাগের আড়াইটে কথা শেষ করতে পারলে না! কত বুড়ো বুড়ো গাধা ঠেঙিয়ে পাস করিয়ে দিলাম আর এই একরত্তি মেয়ের কাছে আমায় হার মানতে হ'ল! কাজ নেই তোর অক্ষর চিনে। সন্ধ্যে পর্য্যন্ত ব'সে ব'সে খালি অ—চ—আর ল—অচল; অ—ধ—আর ম—অধম—এই আওড়াবি। তোর সমস্ত দিন আজ খাওয়া বন্ধ।

বিরক্তভাবে একটা খবরের কাগজ কিংবা বই লইয়া বসিয়া যাই; রাণু ক্রন্দনের সহিত স্বর মিশাইয়া পড়া বলিয়া যায়।

বলি বটে, সন্ধ্যা পর্য্যন্ত পড়িতে হইবে; কিন্তু চড়টা বসাইয়াই নিশ্চিন্ত হইয়া যাই যে, সেদিনকার পড়া ওই পর্য্যন্ত। রাণু এতক্ষণ চক্ষের জলের ভরসাতেই থাকে এবং অশ্রু নামিলেই সেটাকে খুব বিচক্ষণতার সহিত কাজে লাগায়। কিছুক্ষণ পরে আর পড়ার আওয়াজ পাই না; বলি, কি হ'ল?

রাণু ক্রন্দনের স্বরে উত্তর করে, নেই।

কি নেই?—বলিয়া ফিরিয়া দেখি, চক্ষের জল 'অচল' 'অধম'-র উপর ফেলিয়া আঙুল দিয়া ঘষিয়া ঘষিয়া কথা দুইটা বিলকুল উড়াইয়া দিয়াছে—একেবারে নীচের দুই-তিনখানা পাতার খানিকটা পর্য্যন্ত।

কিংবা আঙুলের ডগায় চোখের ভিজা কাজল লইয়া কথা দুইটিকে চিরান্ধকারে ডুবাইয়া দিয়াছে; এইরূপ অবস্থাতে বলে, আর দেখতে পাচ্ছি না, মেজকা।—এই রকম আরও সব কাণ্ড।

চড়টা মারা পর্য্যন্ত মনটা খারাপ হইয়া থাকে, তাহা ভিন্ন ওর ধূর্ত্তামি দেখিয়া হাসিও পায়। মেয়েদের পড়াশুনা সম্বন্ধে আমার থিওরিটা ফিরিয়া আসে; বলি, না, তোর আর পড়াশুনা হ'ল না রাণু; স্লেটটা

নিয়ে আয় দিকিন—দেগে দিই, বুলো। পিঠটায় লেগেছে বেশি? দেখি।

রাণু বুঝিতে পারে, তাহার জয় আরম্ভ হইয়াছে, এখন তাহার সব কথাই চলিবে। আমার কাঁধটা জড়াইয়া আস্তে আস্তে ডাকে, মেজকা!

উত্তর দিই, কি?

আমি, মেজকা, বড় হই নি?

তা তো খুব হয়েছ, কিন্তু কই, বড়র মতন—

বাধা দিয়া বলে, তা হ'লে স্লেট ছেড়ে ছোটকাকার মত কাগজ-পেন্সিল নিয়ে আসব? চারটে উটপেন্সিল আছে আমার। স্লেটে খোকা বড় হয়ে লিখবে 'খন। হঠাৎ শিহরিয়া উঠিয়া বলে, ও মেজকা, তোমার দুটো পাকা চুল গো! সর্ব্বনাশ! বেছে দিই?

বলি, দাও। আচ্ছা রাণু, এই তো বুড়ো হতে চললাম, তুইও দুদিন পরে শ্বশুরবাড়ি চললি। লেখাপড়া শিখলি নি, মরলাম কি বাঁচলাম, কি ক'রে খোঁজ নিবি? আমায় কেউ দেখে-শোনে কি না, বেঁধে-টেধে দেয় কি না—

রাণু বলে, পড়তে তো জানি মেজকা, খালি পেরথোম ভাগটাই জানি না, বড় হয়েছি কিনা। বাড়ির আর কোন্ লোকটা পেরথোম ভাগ পড়ে মেজকা, দেখাও তো!

৩

দাদা ওদিকে ধর্ম্ম সম্বন্ধে খুব লিবারেল মতের লোক ছিলেন, অর্থাৎ হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে অজ্ঞতাটা যেমন গভীর করিয়া রাখিয়াছিলেন, খ্রীষ্ট এবং কবেকার জরাজীর্ণ জুরুয়াস্থ্রিয়ানবাদ সম্বন্ধে জ্ঞানটা সেইরূপ উচ্চ

ছিল। দরকার হইলে বাইবেল হইতে সুদীর্ঘ কোটেশন তুলিয়া সকলকে চমৎকৃত করিয়া দিতে পারিতেন এবং দরকার না হইলেও যখন একধার হইতে সমস্ত ধর্ম্মমত সম্বন্ধে সুতীব্র সমালোচনা করিয়া ধর্ম্মমতমাত্রেরই অসারতা সম্বন্ধে অধার্ম্মিক ভাষায় ভূরি ভূরি প্রমাণ দিয়া যাইতেন, তখন ভক্তদের বলিতে হইত, হ্যাঁ, এখানে খাতির চলবে না বাবা, এ যার নাম শশাঙ্ক মুখুজ্জে !

দাদা বলিতেন, না, গোঁড়ামিকে আমি প্রশ্রয় দিতে মোটেই রাজি নই।

প্রায় সব ধর্ম্মবাদকেই তিনি 'গোঁড়ামি' নামে অভিহিত করিতেন এবং গালাগাল না দেওয়াকে কহিতেন 'প্রশ্রয় দেওয়া'।

সেই দাদা এখন একেবারে অন্য মানুষ। ত্রিসন্ধ্যা না করিয়া জল খান না এবং জলের অতিরিক্ত যে বেশি কিছু খান বলিয়াই বোধ হয় না। পূজা পাঠ হোম লইয়াই আছেন এবং বাক্ ও কর্ম্মে শুচিতা সম্বন্ধে এমন একটা 'গেল গেল' ভাব যে, আমাদের তো প্রাণ 'যায় যায়' হইয়া উঠিয়াছে।

ভক্তেরা বলে, ও রকম হবে, এ তো জানা কথাই, এই হচ্ছে স্বাভাবিক বিবর্ত্তন ; এ একেবারে খাঁটি জিনিস দাঁড়িয়েছে।

সকলের চেয়ে চিন্তার বিষয় হইয়াছে যে, এই অসহায় লাঞ্ছিত হিন্দুধর্ম্মের জন্য একটা বড় রকম ত্যাগ স্বীকার করিবার নিমিত্ত দাদা নিরতিশয় ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন এবং হাতের কাছে আর তেমন কিছু আপাতত না পাওয়ায় ঝোঁকটা গিয়া পড়িয়াছে ছোট কন্যাটির উপর।

একদিন বলিলেন, ওহে শৈলেন, একটা কথা ভাবছি,—ভাবছি বলি কেন, এক রকম স্থিরই ক'রে ফেলেছি।

মুখে গম্ভীর তেজস্বিতার ভাব দেখিয়া সভয়ে প্রশ্ন করিলাম, কি দাদা ?

গৌরীদান করব স্থির করেছি, তোমার রাণুর কত বয়স হ'ল ?

বয়স না বলিয়া বিস্মিতভাবে বলিলাম, সে কি দাদা! এ যুগে—

দাদা সংযত অথচ দৃঢ় কণ্ঠে বলিলেন, যুগের 'এ' আর 'সে' নেই শৈলেন, ওইখানেই তোমরা ভুল কর। কাল এক অনন্তব্যাপী অখণ্ড সত্তা এবং যে শুদ্ধ সনাতনধর্ম্ম সেই কালকে—

একটু অস্থির হইয়া বলিলাম, কিন্তু দাদা, ও যে এখনও দুগ্ধপোষ্য শিশু।

দাদা বলিলেন, এবং শিশুই থাকবে ও, যতদিন তোমরা বিবাহবন্ধনের দ্বারা ওর আত্মার সংস্কার ও পূর্ণ বিকাশের অবসর ক'রে না দিচ্ছ। এটা তোমায় বোঝাতে হ'লে আগে আমাদের শাস্ত্রকাররা—

অসহিষ্ণুভাবে বলিলাম, সে তো বুঝলাম, কিন্তু ওর তো এই সবে আট বছর পেরুল দাদা, ওর শরীরই বা কতটুকু আর তার মধ্যে ওর আত্মাই বা কোথায়, তা তো বুঝতে পারি না! আমার কথা হচ্ছে—

দাদা সেদিকে মন না দিয়া নিরাশভাবে বলিলেন, আট বৎসর পেরিয়ে গেছে! তা হ'লে আর কই হ'ল শৈলেন? মনু বলেছেন, 'অষ্টবর্ষা ভবেদ্‌গৌরী নববর্ষেতুরোহিণী'—জানি, অতবড় পুণ্যকর্ম্ম কি আমার হাত দিয়ে সমাধান হবে! ছোটটার বয়স কত হ'ল ?

রাণুর ছোট রেখা পাঁচ বৎসরের। দাদা বয়স শুনিয়া মুখটা কুঞ্চিত করিয়া একটু মৌন রহিলেন। পাঁচ বৎসরের কন্যাদানের জন্য কোন একটা পুণ্যফলের ব্যবস্থা না করিয়া যাওয়ার জন্য মনুর উপরই চটিলেন, কিংবা অত পিছাইয়া জন্ম লওয়ার জন্য রেখার উপরই বিরক্ত হইলেন, বুঝিতে পারিলাম না। কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া একটি দীর্ঘশ্বাস

ফেলিয়া সে স্থান ত্যাগ করিলেন। আমিও আমার রুদ্ধশ্বাসটা মোচন করিলাম। মনে মনে কহিলাম, যাক, মেয়েটার একটা ফাঁড়া গেল।

দুই দিন পরে দাদা ডাকিয়া পাঠাইলেন। উপস্থিত হইলে বলিলেন, আমি ও সমস্যাটুকুর এক রকম সমাধান ক'রে ফেলেছি শৈলেন। অর্থাৎ তোমার রাণুর বিবাহের কথাটা আর কি। ভেবে দেখলাম, যুগধর্ম্মটা একটু বজায় রেখে চলাই ভাল বইকি—

আমি হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম, হর্ষের সহিত বলিলাম, নিশ্চয়, শিক্ষিত সমাজে কোথায় ষোল-সতরো বছরে বিবাহ চলছে দাদা, এ সময় একটা কচি মেয়েকে—যার ন বছরও পুরো হয় নি—তা ভিন্ন খাটো গড়ন ব'লে—

ঝাঁটা মার তোমার শিক্ষিত সমাজকে। আমি সে কথা বলছি না। বলছিলাম যে, যদি এই সময়ই রাণুর বিয়ে দিয়ে দিই, তা মন্দ কি? বেশ তো যুগধর্ম্মটাও বজায় রইল, অথচ ওদিকে গৌরীদানেরও খুব কাছাকাছি রইল। ক্ষতি কি? এটা হবে, যাকে বলতে পারা যায়, মডিফায়েড গৌরীদান আর কি।

আমি একেবারে থ হইয়া গেলাম। কি করিয়া যে দাদাকে বুঝাইব, কিছুই ঠিক করিয়া উঠিতে পারিলাম না।

দাদা বলিলেন, পণ্ডিত মশায়েরও মত আছে। তিনি অনেক ঘাঁটাঘাঁটি ক'রে দেখে বললেন, কলিতে এইটিই গৌরীদানের সমফলপ্রসূ হবে।

আমি দুঃখ ও রাগ মিটাইবার একটা আধার পাইয়া একটু উষ্মার সহিত বলিলাম, পণ্ডিত মশায় তা হ'লে একটা নীচ মিথ্যা কথা আপনাকে বলেছেন দাদা, আপনি সন্তুষ্ট হ'লে উনি এ কথাও বোধ হয়

শাস্ত্র ঘেঁটেই ব'লে দেবেন যে, মেয়েকে হাত-পা বেঁধে জলে ফেলে দিলেও আজকাল গৌরীদানের ফল হবার কথা। কলিযুগটা তো ওঁদের কল্পবৃক্ষ হয়ে দাঁড়িয়েছে, যখন যে বিধানটি চাইবেন, পাকা ফলের মত টুপ ক'রে হাতে এসে পড়বে।

দুইজনেই কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলাম। আমিই কথা কহিলাম, যাক, ওঁরা বিধান দেন, দিন বিয়ে। আমি এখন আসি, একটু কাজ আছে।

আসিবার সময় ঘুরিয়া বলিলাম, হ্যাঁ, শরীরটা খারাপ ব'লে ভাবছি, মাস চারেক একটু পশ্চিমে গিয়ে কাটাব; হপ্তাখানেকের মধ্যে বোধ হয় বেরিয়ে পড়তে পারব।—বলিয়া চলিয়া আসিলাম।

৪

অভিমানের সাহায্যে ব্যাপারটা মাস তিন-চার কোন রকমে ঠেকাইয়া রাখিলাম, কিন্তু তাহার পর দাদা নিজেই এমন অভিমান শুরু করিয়া দিলেন যে, আমারই হার মানিতে হইল। 'ধর্ম্মে'র পথে অন্তরায় হইবার বয়স এবং শক্তি বাবার তো ছিলই না, তবুও নাতনীর মায়ায় তিনি দোমনা হইয়া কিছুদিন আমারই পক্ষে রহিলেন, তারপর ক্রমে ক্রমে ওই দিকেই ঢলিয়া পড়িলেন। আমি বেখাপ্পা রকম একলা পড়িয়া গিয়া একটা মস্তবড় ধর্ম্মদ্রোহীর মত বিরাজ করিতে লাগিলাম।

রাণুকে ঢালোয়া ছুটি দিয়া দিয়াছি। মায়াবিনী অচিরেই আমাদের পর হইবে বলিয়া যেন ক্ষুদ্র বুকখানির সমস্তটুকু দিয়া আমাদের সংসারটি জড়াইয়া ধরিয়াছে। পারুক, না পারুক—সে সমস্ত কাজেই আছে এবং

যেটা ঠিকমত পারে না, সেটার জন্য এমন একটা সঙ্কোচ এবং বেদনা আজকাল তাহার দেখিতে পাই, যাহাতে সত্যই মনে হয়, নকলের মধ্য দিয়া মেয়েটার এবার আসল গৃহিণীপনার ছোঁয়াচ লাগিয়াছে। অসহায় মেজকাকাটি তো চিরদিনই তাহার একটা বিশেষ পোষ্য ছিলই; আজকাল আবার প্রথমভাগ-বিবর্জ্জিত সুপ্রচুর অবসরের দরুন একেবারে তাহার কোলের শিশুটিই হইয়া পড়িয়াছে বলিলে চলে।

সময় সময় গল্পও হয়; আজকাল বিয়ের গল্পটা হয় বেশি। অন্যের সঙ্গে এ বিষয় লইয়া আলোচনা করিতে রাণু ইদানীং লজ্জা পায় বটে, কিন্তু আমার কাছে কোন দ্বিধা-কুণ্ঠাই আসিবার অবসর পায় না; তাহার কারণ আমাদের দুইজনের মধ্যে সমস্ত লঘুত্ব বাদ দিয়া গুরুগম্ভীর সমস্যাবলীর আলোচনা চলিতে থাকে। বলি, তা নয় হ'ল রাণু, তুমি মাসে দুবার ক'রে শ্বশুরবাড়ি থেকে এসে আমাদের সংসারটা গুছিয়ে দিয়ে গেলে, আর সবই করলে, কিন্তু তোমার মেজকাকাটির কি বন্দোবস্ত করছ?

রাণু বিমর্ষ হইয়া ভাবে; বলে, আমরা সব ব'লে ব'লে তো হয়রান হয়ে গেলাম মেজকা যে, বিয়ে কর, বিয়ে কর। তা শুনলে গরিবদের কথা? রাণু কি তোমায় চিরদিনটা দেখতে-শুনতে পারবে মেজকা? এর পরে তার নিজের ছেলেপুলেও মানুষ করতে হবে তো? মেয়ে আর কতদিন নিজের বল?

তোতাপাখির মত, কচি মুখে বুড়োদের কাছে শেখা বুলি শুনিয়া হাসিব কি কাঁদিব, ঠিক করিতে পারি না; বলি, আচ্ছা, একটা গিন্নীবান্নি কনে দেখে এখনও বিয়ে করলে চলে না? কি বল তুমি?

এই বাঁধা কথাটি তাহার ভাবী শ্বশুরবাড়ি লইয়া একটি ঠাট্টার

উপক্রমণিকা। রাণু কৃত্রিম অভিমানের সহিত হাসি মিশাইয়া বলে, যাও মেজকা, আর গপ্প করব না; তুমি ঠাট্টা করছ।

আমি চোখ পাকাইয়া বিপুল গাম্ভীর্য্যের সহিত বলি, মোটেই ঠাট্টা নয় রাণু; তোমার শাশুড়ীটি বড্ড গিন্নী শুনেছি, তাই বলছিলাম, যদি বিয়েই করতে হয়—

রাণু আমার মুখের দিকে রাগ করিয়া চায়, গম্ভীর হইয়া চায় এবং শেষে হাসিয়া চায়। কিছুতেই যখন আমার মুখের অটল গাম্ভীর্য্য বদলায় না, তখন প্রতারিত হইয়া গুরুত্বের সহিত বলে, আচ্ছা, আমি তা হ'লে— না মেজকা, নিশ্চয়ই ঠাট্টা করছ, যাও—

আমি চোখ আরও বিস্ফারিত করিয়া বলি, একটুও ঠাট্টা নেই এর মধ্যে রাণু; সব কথা নিয়ে কি আর ঠাট্টা চলে মা?

রাণু তখন ভারিক্কে হইয়া বলে, আচ্ছা, তা হ'লে আমার শাশুড়ীকে একবার ব'লে দেখব 'খন, আগে যাই সেখানে। তিনি যদি তোমায় বিয়ে করতে রাজি হন তো তোমায় জানাব 'খন; তার জন্যে ভাবতে হবে না। তাহার পর কৌতুকদীপ্ত চোখে চাহিয়া বলে, আচ্ছা মেজকা, পেরথোম ভাগ তো শিখি নি এখনও—কি ক'রে তোমায় জানাব বল দিকিন, তবে বুঝব, হ্যাঁ—

আমি নানান রকম আন্দাজ করি; বিজয়িনী ঝাঁকড়া মাথা দুলাইয়া হাসিয়া বলে, না, হ'ল না—কক্‌খনও বলতে পারবে না, সে বড্ড শক্ত কথা।

এই সব হাসি তামাশা গল্পগুজব হঠাৎ মাঝখানেই শেষ হইয়া যায়; রাণু চঞ্চলতার মাঝে হঠাৎ গম্ভীর হইয়া বলে, যাক, সে পরের কথা পরে হবে; যাই, তোমার চা হ'ল কি না দেখিগে। কিংবা—যাই,

গল্প করলেই চলবে না, তোমার লেখার টেবিলটা আজ গুছোতে হবে; একডাঁই হয়ে রয়েছে—ইত্যাদি।

এই রকম ভাবে রাণুকে নিবিড় হইতে নিবিড়তরভাবে আমার বুকের মধ্যে আনিয়া দিতে দিতে বিচ্ছেদের দিনটা আগাইয়া আসিতেছে।

বুঝি বা রাণুর বুকটিতেও এই আসন্ন বিচ্ছেদের বেদনা তাহার অগোচরে একটু একটু করিয়া ঘনাইয়া উঠিতেছে। কচি সে, বুঝিতে পারে না; কিন্তু যখনই আজকাল ছুটি পাইলে নিজের মনেই শ্লেট ও প্রথম ভাগটা লইয়া হাজির হয়, তখনই বুঝতে পারি, এ আগ্রহটা তাহার কাকাকে সান্ত্বনা দেওয়ারই একটা নূতন রূপ; কেন না, প্রথম ভাগ শেখার আর কোন উদ্দেশ্য থাক আর না থাক, ইহার উপরই ভবিষ্যতে তাহার কাকার সমস্ত সুখ-সুবিধা নির্ভর করিতেছে, রাণুর মনে এ ধারণাটুকু বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে। এখন আর একেবারেই উপায় নাই বলিয়া তাহার শিশু-মনটি ব্যথায় ভরিয়া উঠে; প্রবীণার মত আমায় তবুও আশ্বাস দেয়, তুমি ভেবো না মেজকা, তোমার পেরথোম ভাগ না শেষ ক'রে আমি কক্‌খনও শ্বশুরবাড়ি যাব না। নাও, ব'লে দাও।

পড়া অবশ্য এগোয় না। বলিয়া দিব কি, প্রথম ভাগটা দেখিলেই বুকে যেন কান্না ঠেলিয়া উঠে। ওদিকে আবার প্রতিদিনই গৌরীদানের বর্দ্ধমান আয়োজন। বাড়ির বাতাসে আমার হাঁফ ধরিয়া উঠে। এক-একদিন মেয়েটাকে বুকে চাপিয়া ধরি, বলি, আমাদের কোন্ দোষে তুই এত শিগগির পর হতে চললি রাণু?

বোঝে না, শুধু আমার ব্যথিত মুখের দিকে চায়। এক-একদিন অবুঝভাবেই কাঁদ-কাঁদ হইয়া উঠে; এক-একদিন জোর গলায় প্রতিজ্ঞা

করিয়া বসে, তোমার কষ্ট হয় তো বিয়ে এখন করবই না মেজকা, বাবাকে বুঝিয়ে বলব 'খন।

একদিন এই রকম প্রতিজ্ঞার মাঝখানেই সানাইয়ের করুণ সুর বাতাসে ক্রন্দনের লহর তুলিয়া বাজিয়া উঠিল। রাণু কুণ্ঠিত আনন্দে আমার মুখের দিকে চাহিয়া হঠাৎ কি রকম হইয়া গিয়া মুখটা নীচু করিল; বোধ করি, তাহার মেজকাকার মুখে বিষাদের ছায়াটা নিতান্তই নিবিড় হইয়া তখন ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

গৌরীদান শেষ হইয়া গিয়াছে; আমাদের গৌরীর আজ বিদায়ের দিন। আমি শুভকর্ম্মে যোগদান করিয়া পুণ্যসঞ্চয় করিতে পারি নাই, এ বাড়ি সে বাড়ি করিয়া বেড়াইয়াছি। বিদায়ের সময়ে বরবধূকে আশীর্ব্বাদ করিতে আসিলাম।

দীপ্তশ্রী কিশোর বরের পাশে পট্টবস্ত্র ও অলঙ্কার পরা, মালাচন্দনে চর্চ্চিত রাণুকে দেখিয়া আমার তপ্ত চক্ষু দুইটা যেন জুড়াইয়া গেল। কিন্তু ও যে বড্ড কচি, এত সকালে কি করিয়া বিদায়ের কথা মুখ দিয়া বাহির করা যায়? ও কি জানে, আজ কতই পর করিয়া ওকে বিদায় দিতেছি আমরা?

চক্ষে কোঁচার খুঁট দিয়া এই পুণ্যদর্শন শিশুদম্পতিকে আশীর্ব্বাদ করিলাম। রাণুর চিবুকটা তুলিয়া প্রশ্ন করিলাম, রাণু, তোর এই কোলের ছেলেটাকে কার কাছে—? আর বলিতে পারিলাম না।

রাণু শুনিয়াছি এতক্ষণ কাঁদে নাই। তাহার কারণ নিশ্চয় এই যে, সংসারের প্রবেশ-পথে দাঁড়াইতেই ওর অসময়ের গৃহিণীপনাটা সরিয়া গিয়া ওর মধ্যকার শিশুটি বিস্ময়ে কৌতূহলে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল। আমার কথার আভাসে সেই শিশুটিই নিজের অসহায়তায়

আকুল হইয়া পড়িল। আমার বাহুতে মুখ লুকাইয়া রাণু উচ্ছ্বসিত আবেগে ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

কখনও কচি মেয়ের মত ওকে ভুলাইতে হয় নাই। আমার খেলা-ঘরের মা হইয়া ওই এতদিন আমায় আদর করিয়াছে, আশ্বাস দিয়াছে; সেইটাই আমাদের সম্বন্ধের মধ্যে যেন সহজ এবং স্বাভাবিক হইয়া পড়িয়াছিল, ভাল মানাইত। আজ প্রথম ওকে বুকে চাপিয়া সান্ত্বনা দিলাম—যেমন দুধের ছেলেমেয়েকে শান্ত করে—বুঝাইয়া, মিথ্যা কহিয়া, কত প্রলোভন দিয়া।

তবুও কি থামিতে চায়? ওর সব হাসির অন্তরালে এতদিন যে গোপনে শুধু অশ্রুই সঞ্চিত হইয়া উঠিতেছিল।

অনেকক্ষণ ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া সে থামিল। অভ্যাসমত আমার করতল দিয়াই নিজের মুখটা মুছাইয়া লইল; তাহার পর হাতটাতে একটু টান দিয়া আস্তে আস্তে বলিল, এদিকে এস, শোন মেজকা।

দুইজনে একটু সরিয়া গেলাম। সকলে এই অসম মাতাপুত্রের অভিনয়ের দিকে চাহিয়া রহিল।

রাণু বুকের কাছ হইতে তাহার সুপ্রচুর বস্ত্রের মধ্য হইতে লাল ফিতায় যত্ন করিয়া বাঁধা দশ-বারোখানি প্রথম ভাগের একটা বাণ্ডিল বাহির করিল। অশ্রুসিক্ত মুখখানি আমার মুখের দিকে তুলিয়া বলিল, পেরথোম ভাগগুলো হারাই নি মেজকা, আমি দুষ্টু হয়েছিলুম, মিছে কথা বলতুম।

গলা ভাঙিয়া পড়ায় একটু থামিল, আবার বলিল, সবগুলো নিয়ে যাচ্ছি মেজকা, খু—ব লক্ষ্মী হয়ে প'ড়ে প'ড়ে এবার শিখে ফেলব! তারপরে তোমায় রোজ রোজ চিঠি লিখব। তুমি কিছু ভেবো না মেজকা।

সে মূর্তি লাখের মধ্যেও দৃষ্টি আকর্ষণ করিত; সুতরাং গাড়ির মধ্যে যখন তৃতীয় ব্যক্তি আর ছিলই না, তখন মূঢ়ভাবে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকা ভিন্ন আর উপায়ই ছিল না।

কালো—সে যেমন তেমন কালো নয়; তাহার উপর বেঁটে এবং মোটা। মাথার ব্রহ্মতলে একটা আব, তাহার উপর একটা সুপুষ্ট টৈতন—যেন গোড়াটি সযত্নে বাঁধানো হইয়াছে। এক কানে একটা কলম, অপর কানে পেন্সিল। রগের পাশ দুইটা হালফ্যাশানে চামড়া ঘেঁষিয়া ছাঁটা। রেল-কম্পানির মার্কামারা কালো কোট এবং সেই মেলের পেণ্টালুন পরিয়া গাড়িতে প্রবেশ করিলেন এবং বসিয়াই চটের ব্যাগটা খুলিয়া ফেলিলেন।

তাঁহাকে যে লোকে বিস্ময়নেত্রে দেখেই—এ জ্ঞানটুকু বোধ হয় স্বভাবসিদ্ধ হইয়া গিয়াছে। আমার দিকে এক রকম না চাহিয়াই বলিলেন, এই যে দাঁড়ান একটু, বলি সব—

কোট এবং প্যাণ্ট খুলিলেন। কালো পাঁঠার যেন ছালটা ছাড়াইয়া ফেলা হইল। কোটের নীচে শ্রীশ্রীকালী ছাপ দেওয়া লাল নামাবলি ও প্যাণ্টের নীচে রক্তচেলি বাহির হইয়া পড়িল। পেণ্টালুন এবং কোট তাল পাকাইয়া এক পাশে রাখিলেন। ব্যাগ হইতে একটা টকটকে জবাফুল বাহির করিয়া টিকিতে বাঁধিলেন; কপালে একটা জলজলে সিন্দূরবিন্দু পরিলেন, তাহার পর ব্যাগটার মধ্যে কোট আর জামাটা ঠাসিতে ঠাসিতে দাঁত মুখ খিঁচাইয়া ব্যাগটাকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন, বটে! নেবে না ভেতরে? ভটচাজ্জির চটের ব্যাগ

আবার ইংরিজী কায়দামত মিতাহারী হয়েছেন—তোর ব্যাগের নিকুচি করেছে।

ভয়েই হউক আর যে জন্যই হউক, স্ফীতোদর ব্যাগটি কোট ও প্যাণ্টটিকে আশ্রয় দিল। এ অঘটন-ঘটনে আমায় বিস্ময়নেত্রে চাহিয়া থাকিতে দেখিয়া বলিলেন, খুব সোজা কথা—এ দেশেরই কারিগরেরা না মসলিন তৈয়ের ক'রে গেছে, যার একটা থানকে থান একটা ঝিনুকের খোলে লুকিয়ে রাখা যেত! যাক সে দুঃখের কথা। চাবিটা ক'ষে দিই এই, তারপর দিচ্ছি সব পরিচয়। কত দূরের পাল্লা?

উত্তর দিতে যাইতেছিলাম, এমন সময় দরজার কাছে শব্দ হইল—দণ্ডবৎ বড়হমচারী বাবা, সাহেবকে কেমোন দেখলেন? বোড্ডো গোস্মায়ে ছিলো। সোব জবাবদেহি আপনারই কন্ধা পর—

আরে হীরে সিং যে! হ্যাঁঃ, একটা ইঞ্জিন একটু ডিরেল হয়ে গেছে, তার আবার জবাবদিহি! জল ক'রে দিয়ে এসেছি। এই দেখ, এ কানে কলম, এ কানে পেন্সিল;—দেখেই বেটা হেসে জিজ্ঞাসা করলে, এ কি বাবু? যেন আকাশ থেকে পড়লাম, দেখেছ, কাজের ভিড়ে কলম পেন্সিল কানে যেন কায়েমি বাসা বেঁধেছে একেবারে; আর হুজুরের তলব শুনে কি আর জ্ঞানগম্যি কিছু ছিল? লোকে বলে, সিংহের ডাক! এই তাতটুকু দিতেই মন গলতে আরম্ভ হ'ল বেটার। বললে, না, কাজ কর আর না কর, অমন বেতর মাতাল হয়ে ইষ্টিশনে ঢুকো না বাবু, অনেকগুলো দোষ জ'মে উঠেছে তোমার, এই ফাইল দেখ।

ব্যাগের মধ্যে ছ বোতল সেরা বিলিতী মাল নিয়ে গিয়েছিলাম, একেবারে আনকোরা; টেবিলের ওপর সারবন্দী ক'রে বললাম, ও পাটই উঠিয়ে দিয়েছি হুজুর, ওই ছটি বোতল ছিল, হুজুরের কাছে

জরিমানা দিয়ে যাচ্ছি—এই নাকে হাত দিলাম, এই কানে হাত দিলাম।

একেবারে জল, বললে, এখনও রিপোর্টটা পাঠাই নি, দেখি ভেবে তা হ'লে ; কিন্তু দেখো, সাবধান।

ছ আষ্টে আটচল্লিশটি টাকা লম্বা হয়ে গেল—তা আর কি করব ? বেটা একটু টানেটোনে ব'লেই এই ক'রে চালিয়ে যাচ্ছি ; না হ'লে চাকরি কি আর থাকত হীরে সিং ? ব্যাগের দিকে চাইছিস ? তিনটে বোতল কিনে নিলাম তাড়াতাড়ি—আজ আবার দাসু খুড়োর ওখানে মায়ের পূজো—তুই বেটা যাবি নি ?

হীরা সিং দুঃখের হাসি হাসিয়া বলিল, মাকে পরনাম হোই দেওতা ; আজ ডিউটি পড়িয়ে গেসে ; নইলে আমার তো ষোড়্হো আনা খাঁইস ছিল।

এই দেখ বেটার মতিচ্ছন্ন ; নাম শুনেও ডিউটির খেয়ালে গরহাজির হয়ে একটা কাণ্ড বাধাবে দেখছি ! নে, উঠে আয়। না না, আর অমত করিস নি হীরে সিং, ওইটুকু ব'লেই মাকে ঢের চটিয়েছিস—তোর আমার আবার ডিউটি কি র‍্যা ? এই আমিই কার ওপর সব ছেড়ে টহল দিয়ে বেড়াচ্ছি ? তাঁর ডিউটি তিনি বুঝে নেবেন, তুই উঠে আয়।

হীরা সিং ইতস্তত করিতেছিল, এমন সময় গার্ড হুইস্‌ল দিল। যড়হমচারী আমার দিকে না দেখিয়াই বলিলেন, রগের চুলছাঁটা দেখছেন ? ওটা সবারই চোখে ঠেকে। দাঁড়ান, ও বেটাকে তুলি আগে, তারপর সব বলছি। ওটা সেজো আবাগীর আবদার ; কিন্তু সব কথা না বললে বুঝতে পারবেন না। হীরে সিং, উঠে আয় বাপধন, দাসু খুড়ো আজ মার রাজসূয় যজ্ঞ করাচ্ছে ; 'কারণে' আজ ডুবসাঁতার কাটতে হবে—নে, উঠে আয়।

গাড়ি ছাড়িয়া দিল।

ডিউটি ছিল, কাল সাহেব গর্দ্দানা লিবে।—বলিতে বলিতে হীরা সিং গাড়িতে উঠিয়া পড়িল। দেওতার পায়ে হাত দিয়া, হাতটা কপালে ঠেকাইয়া সামনে বসিয়া পড়িল।

জিতা রও বেটা, সুবুদ্ধি হোক।—বলিয়া দেওতা ব্যাগ খুলিয়া একটি সদ্যক্রীত বোতল ও একটা গেলাস বাহির করিয়া তাহার হাতে দিলেন—নে, সিলটা খুলে ফেল্ দিকিন, একটু পেসাদ ক'রে দিই, তারপরে সাধ থাকে ডিউটির কথা ভাবিস, বেটা কুসন্তান কোথাকার! এরই নাম জমাদার হীরা সিং। এই তিনটি বোতল তিন চুমুকে সাবড়ে ওই ভৈরবী নদীর নেড়া পুলের ওপর দিয়ে গটগট ক'রে পার হয়ে যেতে পারে। জংশন ইষ্টিশনের হেড পয়েন্টস্‌ম্যান, এক কথায় ডিউটি ফেলে মার টানে উঠে এল।—শেষের কথাগুলি আমায় বলিলেন। হীরা সিং সম্বন্ধে পূর্ব্বে কৌতূহলের তেমন বিশেষ কারণ না থাকিলেও পরিচয়ে উদ্রেক হইল বটে; এবং হীরা সিঙের মহত্ত্ব ও জংশন স্টেশনের আসন্ন বিপদের কথা ভাবিয়া মনে মনে শিহরিয়া উঠিলাম।

দেওতার পীতাবশিষ্ট পেসাদটুকু নিঃশেষ করিয়া হীরা সিং গোঁফ-জোড়া মুছিয়া একটু পাকাইয়া লইল; মনে হইল, সে এইবার গাড়ি হইতে লাফ দেওয়া কিংবা নেড়া পুল পার হওয়ার অনুরূপ একটা দুরূহ কার্য্যের জন্য তৈয়ার হইতেছে; কিন্তু সেসব কিছুই না করিয়া হীরা সিং আস্তে আস্তে টলিতে টলিতে আসিয়া আমার পায়ের উপর তাহার মাথাটা চাপিয়া ধরিল এবং একটু পরে হাউহাউ করিয়া ক্রন্দন শুরু করিয়া দিল।

ভাবিলাম, এ তো ভ্যালা বিপদ, বেটা আধ ছটাক খাইয়াছে কি না ঠিক নাই! একেবারে ভূত!

বড়হমচারী ওর চুমো টানিয়াও নির্ব্বিকার; বুঝিলাম, হাঁ, বড়র মুখেই ক্ষুদ্রের প্রশংসা মানায় বটে। বলিলেন, ওর অনেক দুঃখু, সব বলব 'খন, আর একটু সবুর করুন না। আজ গার্ড ড্রাইভার কে র‍্যা বেটা ? নে, উঠে আয়।

হীরা সিং আমার পা আরও জোর করিয়া ধরিল; জড়িত অশ্রুনিরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, গরিব হীরা সিং ছ্যমা মাঙছে।

রাগে একটা হেঁচকানি দিয়া পা ছাড়াইয়া লইলাম; বলিলাম, আচ্ছা মাতালদের পাল্লায় পড়া গেল তো!

দেওতা হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন; বলিলেন, আরে না না, ও চুমো চাইছে না, ওকে ক্ষমা করতে হবে; বেটারা 'ক্ষ'-কে 'ছ্য' ব'লে সব মাটি করে যে—ভয় নেই—হাঃ হাঃ হাঃ। আয় বেটা, উঠে আয়, জিবের আড়টা ভেঙে নে দিকিন—একটু হ'লে কেলেঙ্কারি বাধাতিস আর কি! ভাব্‌ দিকিন, যদি উনি কোন বড়ঘরের লেডি হতেন! আচ্ছা, আমিই ওর হয়ে অ্যাপলজি চাইছি।—বলিয়া উঠিয়া আসিয়া করুণভাবে আমার হাতটা চাপিয়া ধরিয়া আবার স্বস্থানে গিয়া বসিলেন। দেখিলাম, ক্রমে ক্রমে তাঁহারও অবস্থা সঙিন হইয়া আসিতেছে।

হীরা সিং আবার বজ্রমুষ্টিতে আমার পা ধরিয়াছিল। আমি নিরুপায় হইয়া তাহাকে ভাল কথায় বলিলাম, নে, তোকে করলাম ছ্যমা—আর যেন টানিস-টুনিস নি—যা, গিয়ে ব'স্‌ দিকিন এখন।

এ জিন্দগিমে আবার শরাব? এই গুরুর শপথ খাচ্ছি, হীরা সিঙের শপথকে ওই দেওতা চিনেন, দেওতার জন্যে আমার ধন-মান-কুল। আবার গলা ভারী হইয়া আসিল।

দেওতা ডাক পাড়িতেছিলেন, হীরা সিং আস্তে আস্তে গিয়া পায়ের কাছে বসিল, গেলাসটি হাতে লইল, তাহার পর আমার দিকে বাঁ হাতটা আড়াল করিয়া চুমুক লাগাইল।

বড় পাজি জিনিস। অ্যাজ এ ফ্রেণ্ড অ্যাড্‌ভাইস দিচ্ছি, কেউ মাথার দিব্যি দিলেও ধরবেন না। আমার কথা? একটু মেডিসিন-ডোজে চালাই কখনও কখনও, তাও কেন যে ধরেছি সব কথা বললেই বুঝতে পারবেন, একটু সবুর করুন না, সব বলছি।

একটু সবুর করিবার পর গাড়ি আসিয়া পরের স্টেশনে থামিল। দেওতা বলিলেন, যা বেটা, দেখ্ দিকিন—গার্ড আর ড্রাইভার কে! হঠাৎ চোখ রাঙাইয়া উগ্রভাবে বলিলেন, যেই হোক, টিকি ধ'রে টেনে নিয়ে আসবি, বলবি, বড়হমচারী বাবার হুকুম, ইয়ারকি না, যা।—বলিয়া পৃথিবীতে তাঁহার হুকুমগুলা ঠিকমত তামিল হইতেছে না, বোধ হয় এই রকম একটা ধারণা করিয়া লইয়া রাগতভাবে মুখটা গোঁজ করিয়া বসিয়া রহিলেন।

হীরা সিং ভক্তিভরে তাঁহার পায়ের ধূলা লইয়া টলিতে টলিতে নামিয়া গেল; প্ল্যাটফর্মে দাঁড়াইয়া শেষ বিদায়ের মত হাতজোড় করিয়া বলিল, গরিবকে অসমরণ রাখবেন বাবা।

দেওতা অবিচলিতভাবে বসিয়া রহিলেন, হীরা সিং চলিয়া গেলে আবার সহজ ভাব ধারণ করিয়া আমাকে বলিলেন, সার্থক নাম বেটার, একখানি হীরের টুকরো। তাহার পর যুক্তকর কপালে ঠেকাইয়া বলিলেন, জংশনের পয়েণ্টগুলো সামলে দিস মা, দশমহাবিদ্যারূপিণী; নয়তো দুর্নাম নিবি বেটী—

চুপ করিয়া হীরার হীরাত্ব এবং মা আজ দশমহাবিদ্যার কোন্ রূপটি লইয়া পয়েণ্টগুলির নিকট আবির্ভাব হইবেন ভাবিতেছিলাম, এমন সময়

হীরা সিং একটা মুসলমান ড্রাইভার ও একজন ফিরিঙ্গী গার্ডকে সঙ্গে করিয়া হাজির হইল। তাহারা আসিয়া হীরা সিঙেরই মত বলিল, দণ্ডবৎ বড়হমচারী বাবা।

বাবা রক্ত চক্ষু এবং কম্পিত হস্ত তুলিয়া নীরবে আশীর্ব্বাদ করিলেন, তাহার পর বোতলটা এবং গেলাসটা বাড়াইয়া দিয়া বলিলেন, তোর ইঞ্জিন চলছে না যে আলিজান, নে, একটু স্টীম ক'রে নে।—কে, পিটার গার্ড সাহেব? নাও, একটু চড়িয়ে নাও, ঘাট স্টেশন পৌছুতে যার নাম রাত দুটো; আজ দাসু খুড়ো মার পূজো করছে—নেমন্তন্ন রইল। ঘণ্টা দুতিন লাগবে; ফার্স্ট সেকেণ্ড ক্লাসে কোন প্যাসেঞ্জার আছে নাকি?

পিটার সাহেব গেলাস হাতে করিয়া তাচ্ছিল্যভরে ওষ্ঠাধর কুঞ্চিত করিয়া বলিল, ইয়েস, কোঠিয়াল বিলিয়াস সাহেব সিকিন কিলাসমে হ্যায়। আরে হ্যায় তো হ্যায়; ওয়েসা সাহেবকো পিটার গার্ড 'সাহেব' নেহি কহতা—কভি ওসব ওলায়েৎ দেখা হ্যায়? হামারা গ্র্যাণ্ডফাদার—

বড়হমচারী পিটারের মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া জড়িত কণ্ঠে বলিলেন, ওর গ্র্যাণ্ডফাদার প্রকাণ্ড জাহাজের ফায়ারম্যান ছিল—কতবার যে বিলেতে যাওয়া-আসা করেছিল, তার হিসেব নেই; পিটার তো এদেশী সাহেবগুলোকে সাহেবই বলে না। তারপর একটু হাসিলেন—বোধ হয় এহেন কুলীন পিটারের সাহচর্য্যগৌরবে।

পিটার সাহেব গেলাসে ধীরে ধীরে চুমুক দিতে দিতে এদেশী সমস্ত সাহেবদিগের উপর অবজ্ঞা ও ক্রোধের নিদর্শনস্বরূপ গেলাসের আড়াল হইতে আমার পানে ঘন ঘন উগ্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিল।

আলিজানের মুখ-চোখে রঙ ধরিয়া আসিতেছিল, দৃপ্তভাবে বলিল, কেয়া, হাম্‌ভি সাদা চামড়াসে থোড়াই ডর করি। হাম দো ঘণ্টা, চার

ঘণ্টা, দশ ঘণ্টা দেরি করেগা, খুশি হামারা। বোলাও সিকিন কিলাসকা সাহেবকো। কালীমাইকা সামনে আঙ্গরেজ?

বড়হমচারী বাবা আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, করিম বক্স ডাকাত ওরই ঠাকুরদাদার বাবা ছিল কিনা;—ভয়ানক কালীভক্ত, পূজো ক'রে বেরুলে তাকে রোখে কে? কত কুঠিয়ালের মাথা নিয়েছিল, তার কি ঠিকানা আছে? সব একে একে বলছি, একটু সবুর করুন না, অত উতলা হ'লে চলবে কেন মশাই?

আলিজান হঠাৎ বিরক্তভাবে পিটারের হাত হইতে গেলাসটি ছিনাইয়া লইয়া বোতল হইতে ছাপাছাপি এক গেলাস ঢালিয়া লইল, তাহার পর এক নিশ্বাসে সেটা শেষ করিয়া বিনাবাক্যব্যয়ে গটগট করিয়া নামিয়া গেল। পিটার অবিচলিতভাবে শূন্য গেলাসটা পূর্ণ করিতে লাগিল। আলিজানের ভাব দেখিয়া বোধ হইল, তাহার ঘাড়ে হঠাৎ তাহার কুঠিয়াল-বিধ্বংসী পূর্ব্বপুরুষের ভূত চাপিয়াছে। জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া সশঙ্কিতভাবে সেকেণ্ড ক্লাসে একটা হৈ-চৈয়ের প্রতীক্ষা করিতেছি, এমন সময় একটা প্রচণ্ড রকম ঝাঁকানি দিয়া গাড়িটা একেবারে ভৈরববেগে ছুটিতে আরম্ভ করিয়া দিল। মনে হইল, ড্রাইভারের ছোঁয়াচ লাগিয়া এঞ্জিনটাও যেন এক মুহূর্ত্তে মাতাল হইয়া উঠিয়াছে।

পিটার সাহেব পকেট হইতে হুইস্‌লটা বাহির করিল; সেইখানে বসিয়াই খুব জোরে ফুঁ দিয়া পকেটে রাখিয়া দিয়া বলিল, হম আঙ্গরেজকা বাচ্চা, ডিউটি নেহি ভুল্ সাকতা।

বড়হমচারী বাবা আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, আলিজান একবার রাগলে কারও রক্ষে নেই।

আমি গাড়ির মত্ত বেগ লক্ষ্য করিয়া বলিলাম, রক্ষের তো উপায়

দেখছি না ঠিক ; তবে হঠাৎ রাগল কেন, তা তো বুঝতে পারি না। আপনারা মশায়, এতগুলো লোকের প্রাণ নেবেন নাকি ? আমি তো পরের স্টেশনে গিয়েই ডি. টি. এস.কে তার করছি।

দেওতা ঈষৎ হাস্য করিয়া জড়িত কণ্ঠে বলিলেন, অনেক সময় পাবেন ; আমাদের ওখানে দু-চার ঘণ্টার বেশি লাগবে ; তারবাবুর বাড়িতেই আজ মা অবতীর্ণা হবেন কিনা।

হতাশ হইয়া চুপ করিয়া রহিলাম।

হীরা সিং নেশায় আচ্ছন্ন হইয়া অসাড়ভাবে পড়িয়া ছিল।

বড়হমচারী বাবা বোতলটা উপুড় করিয়া গলায় ঢালিয়া দিয়া বিষণ্ণ বদনে পিটারের দিকে চাহিয়া বলিলেন, পিটার গার্ড, ককৃখনও তিনটে শাদি করিস নি বাপ, ধনে প্রাণে মারা যাবি—চারটে কর্, আটটা কর্, তারা জোড়া বেঁধে নিজেদের মধ্যে ঝোঁটাঝুঁটি ক'রে মরবে। তুই দিব্যি 'জিতু জিতু মোর মামা' করবি ; কিন্তু যদি একটি বেজোড় ছেড়ে রাখ, সেটি তোমার ঘাড়ে চাপবে। আমার সেজো আবাগীর কথাই ধর না ভাই ; বড়য় মেজোয় হরদম মাথা-ফাটাফাটি করছে—বেশ শান্তিতে থাকতাম ; কিন্তু সেজো আবাগীকে এনেই—

গার্ড সাহেব আমার দিকে দেখাইয়া বলিল, ই বাবু পিতে নেহি হ্যায় ? দেওতা, দিয়া ইনকো ?

নাঃ, উনি এদিকে নেই। কেত্তা কিসিমকা আজব আদমি জগদম্বা বানিয়েছে রে দাদা ; দুনিয়াটা চিড়িয়াখানা। কি যে বলছিলাম, হ্যাঁ, তিনটে শাদি ক'রো না পিটার সাহেব—জেরবার হবে। দশটা কর, বারোটা কর, ষোলটা কর, বাধা দোব না ; বেজোড়ের দিকে ঘেঁও না, পাঁচটা নয়, সাতটা নয়, একুশটা নয়—নাও, বোতলটা খোল।

পিটার সাহেব বোতলটা হাতে লইয়া বিমর্ষভাবে বলিল, হামারি আওরাৎ আকেলেহি একেইশ হ্যায়। কাল দোঠো ওসাজিব বাত বোলনে গিয়া। ইয়ে দেখো নতিজা।—দেখাইয়া দিল।

ও বাবা, তোকেই উল্টে মার দেয়! মেয়েমানষের দাঁত-নড়ানো ঘুষি!

আওর কোই আধা সের লেহু নাকসে নিকলা।

ইংরেজ বউকে ক্ষুরে ক্ষুরে নমস্কার বাবা, বেশ আছি; আমার কোনও আবাগী গায়ে হাত তোলে নি কখনও। ডাইভোর্স ক'রে দিস না কেন মাগীকে? তোদের জাত বুঝে যীশু তো সে ব্যবস্থা ক'রে গেছে।

বোলতি হ্যায়, ডাইভোর্স করনেসে খুন করেগি।

না করলেও বা কোন্ বাকি রাখছিস বাপু? এক কাজ কর্, আমি হদিস বাতলে দিচ্ছি—দেখবি, অমন দজ্জাল মাগ তো—একেবারে কেঁচো হয়ে গেছে। তিন-তিনটে বাঘিনী নিয়ে ঘর করছি রে দাদা, ওসব ঢের দেখা আছে। সেজো আবাগী অভিমান ক'রে বললে, একটু ভাল ক'রে ফিটফাট হয়ে থাকতে পার না? বুঝলাম, কথাটা যৌবনের রস; তার পরদিনই নাপতে ডাকিয়ে দুই কানের ওপরটার চামড়া বের ক'রে ছোকরা বাবু হয়ে পড়া গেল। আর কিছু আবদার নেই, সব মিটে গেছে—এখন দেখলে নাক সিঁটকোয়। যে যেমন, তার সঙ্গে সেই রকম চালাও। বড় আবাগী বললে, তোমার হাতে প'ড়ে পাপে তাপে তো জীবনটা দ'গ্ধে গেল, আর কেন? একটু তীর্থ-টীর্থ করিয়ে আন না, এটুকুও হবে না? বললাম, সে কি কথা! হবে বইকি। এলাহাবাদ ত্রিবেণীর ঘাটে—ও-ও ডুব দিতে নামল, আমিও বগলে বোতল বাগিয়ে উঠলাম, সাত দিন দুজনের দেখা নেই—দু মাস

কথা কয় নি—আজ পর্য্যন্ত তীর্থের নাম করে না। একটু সবুর কর্ না, তোকে আমি এসা এক মতলব বাতলে দিচ্ছি—

আচ্ছা, একঠো খাস্‌সি চড়হানেসে তুমলোগোঁকী কালীজী কুছ বন্দোবস্ত কর্ সকতী?

খুব খুব; আরে, কালী আর তোদের যীশুর মা মেরী তো খুড়তুতো জাঠতুতো বোন ছিল—যার নাম 'চাচেরা বহিন'—বুঝা? তোরা কি আর মার পর?

এমন সময় দুই-তিন বার ঘ্যাচাং ঘ্যাচাং শব্দ করিয়া গাড়িটা হঠাৎ থামিয়া গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে—'বড়হমচারী বাবা, ও বড়হমচারী বাবা' 'দাদা, দাদা' 'ও খুড়ো, কোন্ গাড়িতে হে?' ইত্যাকার কতকগুলো অসংলগ্ন আওয়াজে স্টেশন-প্ল্যাটফর্মটা সরগরম হইয়া উঠিল। বি-এন-ডব্লুর ব্র্যাঞ্চ ট্রেন—বলাই বাহুল্য যে, কোনও গাড়িতেই আলো ছিল না। শেষ পর্য্যন্ত দেওতার আওয়াজ ও পিটার গার্ডের হুইস্‌ল লক্ষ্য করিয়া যখন উভয় পক্ষের মিলন হইল, তখনকার সেই পৈশাচিক উল্লাস ও চীৎকার মসীজীবী নিরীহ কলমের মুখে প্রকাশ করা যায় না।

দাস্থ খুড়োকে দেখিলাম। রাজসূয় যজ্ঞ করিবার মত লোক বটে। লিকলিকে, খর্ব্ব; মদে যদি ভারী হইয়া অমন গড়াইয়া গড়াইয়া না পড়িত তো হাওয়ায় উড়িবারই কথা। যতক্ষণ দেখিলাম, ডান হাতে ঘুষি বাগানোই ছিল। বলিল, দাদা, বেটা ডেন্‌ফোর্ড তোমায় ডেকে পাঠিয়েছিল সামান্য একটু ডিরেলের জন্যে? আমি দেখে নোব সম্বন্ধীকে—এই একটি ঘুষি! আলিজান, পিটার গার্ড, ব্যাক কর গাড়ি—চল জংশনে—দেখেগা ক্যায়সা সাহেব হ্যায়—দেসো শালা বেঁচে, আর তোমার কাছে এক্সপ্ল্যানেশন চাইলে দাদা? আমাদের লর্ড বিশপের অপমান!

আলিজানের নেশাটা একটু ফুরাইয়া আসিয়াছিল। সেইজন্যই হোক আর যে কারণেই হোক, সে ব্যাক করিতে নারাজ হইল; তখন দাস্থ খুড়া নিজের শক্তি ও শৌর্য্যের অভিব্যক্তি সম্বন্ধে এদিকে নিরাশ হইয়া, মৃতপ্রায় হীরা সিঙের শরীরটা কাঁধে ফেলিয়া একলা বাসায় লইয়া যাইবার জন্য জিদ ধরিয়া বসিল। এ ব্যাপারের কিরূপ মীমাংসা হইত বলা যায় না, তবে এই নারকীয় গোলমালে এবং তাহার শরীরটা লইয়া টানাটানি করাতে হীরা সিঙের তন্দ্রা একটু ভাঙিয়া যাওয়ায় সে 'ছ্যমা'র জন্য আমার পা জড়াইয়া ধরিয়া হতাশভাবে কাঁদিতে লাগিল। এই সঙ্কল্প জানাইল যে, আমি ছ্যমা না করিলে বাঙ্গালী তো কোন্ ছার, স্বয়ং হনুমানজী আসিলেও তাহাকে নড়াইতে পারিবে না।

আমি প্রায় বিশ-পঁচিশ বার স্বীকার করিলে যখন তাহার আর মোটে সন্দেহ রহিল না, সে সবাইকে ঠেলিয়া-ঠুলিয়া আপনিই টলিতে টলিতে নামিয়া গেল।

বড়হমচারী বাবা, হীরা সিং, আলিজান আর ও পক্ষের সবাই হৈ-হৈ করিতে করিতে, টলিতে টলিতে, পড়িতে পড়িতে দাস্থ খুড়োর বাসার দিকে চলিল। বলিলাম, গার্ড সাহেব, মিঞা সাহেব, আমার কাল সকালের মধ্যে ঘাট স্টেশনে পৌছানো চাই—গবর্মেণ্টের জরুরি কাজ—

দাস্থ খুড়া টলিতে টলিতে ঠেলিয়া আসিয়া তাহার হাড্ডিসার ঘুষি আমার নাকের সামনে বাঁকাইয়া ধরিয়া বলিল, একটি ঘুষিতে গবর্মেণ্টের বত্রিশ পাটি দাঁত খসিয়ে দোব। তাদের জরুরি কাজ তারা বুঝবে—আমার রিলিজিয়াস টলারেশনে হাত দেবার কে হ্যা?

বড়হমচারী বাবা ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া—স্রোতের ধারের বেতগাছের মত দুলিতে দুলিতে বলিলেন, আমারও তো ভোরের স্টীমারে ওপারের

স্টেশন-মাস্টার রামদয়ালের বাড়িতে যেতে হবে—বড় ঘটা ক'রে রাধামাধবজীর পিতিষ্ঠে করবে কিনা; আপনার এই দাসানুদাসের ওপর সব ভার। ওপার থেকে আর ইস্তক জংশন পর্য্যন্ত সব ব্যাপারে বাবা এই কালী বেহ্মচারী। ডালে আছি, ঝোলে আছি, অম্বলে আছি, ঘাবড়ান কেন? একটু সবুর ক'রে ব'সে থাকুন—দেখবেন, আপনার এ গোলামের গোলামকে না হ'লে কারুর এক পা এগুবার জো নেই—শাক্ত হোক, বোষ্টম হোক, শৈব হোক, কেরেস্তান হোক—

পিটার হঠাৎ তাঁহার হাতটা ধরিয়া একটা টান দিল, ঘৃণার সহিত বলিল, আরে চলো, কভি শরাব নেহি পিতা, ওই তুমহারা কদর কেয়া বুঝেগা?

বড়হমচারী তাঁহার অর্দ্ধনিমীলিত চক্ষুপল্লব যেন হঠাৎ চাড়া দিয়া তুলিয়া আমার দিকে কটমট করিয়া চাহিয়া শাপ দেওয়ার ভঙ্গীতে বলিয়া উঠিলেন, আমার 'কারণ'কে অপমান করেছিস—মনে থাকে যেন।

র‍্যাপারটা টানিয়া লইলাম। মুড়িসুড়ি দিয়া রাত্রের মত বেঞ্চের উপর শুইয়া বি-এন-ডব্লুর মহিমার এই নূতন স্বরূপটির কথা ভাবিতে লাগিলাম।

"গজভুক্ত—"

১

সকালে বেশ এক পসলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। আকাশটা আবার ঘোর করিয়া আসিতেছে ; যদি নেহাত এখন বৃষ্টি না-ই নামে তো রাত্রি পর্য্যন্ত যে একটা রীতিমত দুর্য্যোগ সৃষ্টি হইবেই, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

আকাশের গতিক দেখিয়া মেসের আর কেহ বাহির হয় নাই। দুই-একজন নিজের নিজের ঘরেই বসিয়া ছিল ; বাকি মেম্বর সব শচীনাথের ঘরে আড্ডা জমাইবার উদ্যোগ করিতেছিল ; আজকাল অবসরকালে এই ঘরেই বেশি জমায়ৎ হইয়া থাকে, কারণ ছোকরার নূতন বিবাহ হওয়ায় ঘরটি শ্বশুরবাড়ির সম্পদে ও ভাবে সমৃদ্ধ।

মেসের কবি কুলদাচরণ জানালার ধারে বসিয়া গুনগুন করিয়া গান করিতে করিতে মেঘের গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছিল। মেঘ হইতে চোখ না ফিরাইয়াই বলিল, আচ্ছা শচীবাবু, বলুন তো আজকের রাত্তিরটা সার্থক হয় কি হ'লে ?

শচীনাথ লজ্জিতভাবে একটু হাসিল, উত্তর দিল না। গণপতি নিজের বামবাহুর সুপুষ্ট পেশীটা পাকাইয়া পাকাইয়া নানা ভঙ্গীসহকারে পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিল, সেইরূপ ভাবেই বলিল, এই খিচুড়ি আর গলদা-চিংড়ির কালিয়া হ'লে।

কুলদা তাহার দিকে একটা বিরক্তিপূর্ণ দৃষ্টি হানিয়া আবার মুখ ফিরাইয়া মেঘের কাব্য উপভোগ করিতে লাগিল। কিন্তু গণপতির কথাটা মাঠে মারা গেল না, কারণ ঘরটায় কাব্যরসিকের চেয়ে ঔদরিকের সংখ্যাই অধিক ছিল ; অন্তত এমন বর্ষায় সংখ্যাটা বাড়িয়া গিয়াছিল,

এরূপ বলা যায়। কেহ বলিল, বাঃ, খাসা মতলব! আর একজন বলিল, গণপতির মাথা আছে। মৃত্যুঞ্জয় 'মাথা'র লোভে বলিল, আমিও খিচুড়ির কথা বলব বলব করছিলাম।

ফর্দ্দ হইল। মেসের ভোজের ফর্দ্দ—প্রত্যেক মেম্বরের পছন্দের কিছু কিছু রক্ষা করিতে করিতে টোটাল প্রথমে পঞ্চাশ টাকার কাছাকাছি দাঁড়াইল। যাহারা ঝুঁকিয়া দেখিতেছিল, একটু পিছাইয়া গেল। সকলের মতানুযায়ী আবার কাটছাঁট করিতে করিতে সতরো টাকায় দাঁড়াইল। তৃতীয় বারে সতর্কভাবে বাড়াইয়া বাড়াইয়া তেত্রিশ টাকায় হিসাবটা কায়েম করা হইল। যাহার হাতে পেন্সিল ছিল, সে পেন্সিল ফেলিয়া হাত-পা গুটাইয়া বলিল, এর কমে হ'লে, ঝালচানা খেয়ে বর্ষার শখ মেটাতে হয়; ফিষ্টি হয় না।

ষোলজন মেম্বর, দুই টাকা এক আনা করিয়া পড়িবে। মাসের উনত্রিশ তারিখ। সকলে মৌনভাবে বসিয়া রহিল। কেহ বেপরোয়া ভাবটা জাগাইয়া রাখিবার জন্য একটু শিস দেওয়ার চেষ্টা করিতে লাগিল। একজন বলিল, কেউ দুটো টাকা ধার দেন তো বাকি এক আনা পয়সা বাক্স ঝেড়ে বের করতে পারি।

একজন উত্তর করিল, আপনি তো তা হ'লে খুব সল্‌ভেণ্ট মশায়, হিংসে করে।

শচীনাথ মনে মনে অতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িতেছিল। বিবাহ করার পর তাহার খাওয়ানো বাকি ছিল। অনেক তাগাদা ঠেকাইয়া আসিয়াছে; কিন্তু আজ মেসের এই দারুণ বুভুক্ষা এবং সেই সঙ্গে ততোধিক দারুণ দৈন্যের দিনে আর ঠেকানো অসম্ভব। তাহার বুকের ভিতর ধড়াস ধড়াস করিতেছিল। ইহাদের একবার কাহারও মনে পড়িলে হয়; কেন যে পড়িতেছে না, সেইটাই আশ্চর্য্য!

যেমন বসিয়া ছিল, সেইরূপ থাকিয়া গেলে কি হইত বলা যায় না; সে পরিত্রাণ পাইবার জন্য আস্তে আস্তে বাহির হইয়া যাইতে চেষ্টা করিয়াই সব মাটি করিল। চৌকাঠের নিকট পা দিতেই একজন টেবিলে একটা প্রচণ্ড চাপড় দিয়া বলিল, হয়েছে। শচীবাবু!

শচীনাথ বিমর্ষ মুখে ফিরিয়া চলিল।

যে ডাকিয়াছিল, সে বলিল, আসুন, ফাঁকি দিলে চলবে না। বিয়ের খাওয়াটা আজই হয়ে যাক।

সমর্থনস্বরূপ ঘরটাতে একটা ভীষণ আনন্দ-কলরব উঠিল। তাহাতে লাজুক বেচারার ক্ষীণ আপত্তিটুকু শোনাই গেল না। একজন আবার বলিল, পরশু আবার একটা মোটা মানিঅর্ডার এসেছে—

শচীন্দ্র নামক একজন মেম্বর বলিল, শ্বশুরবাড়ি থেকে। মবলগ আশিটি রজতখণ্ড—নামের একটু মিল আছে কিনা—তাই প্রথমে আমারই হাতে গিয়ে পড়েছিল। হায়, এমনই যদি অদৃষ্টেরও মিল থাকত!

একজন বলিল, তবে সেই পঞ্চাশ টাকা যেমন ধরা হয়েছিল, তেমনই থাক না কেন? শচীবাবু সেই খাওয়াচ্ছেন, অথচ চিরজন্মের মত ওঁর মনে একটা খুঁতখুঁতুনি থেকে যাবে, সেটা কি হতে দেওয়া উচিত আমাদের?

শচীনাথ অকৃতজ্ঞভাবে তাহার দিকে একবার চাহিল, তাহার পর কাহারও দিকে না চাহিয়া বলিল, সত্তর টাকা খরচ হয়ে গেছে; দশ টাকা আছে প'ড়ে; যাবার ভাড়া রেখে পাঁচ টাকা কোন রকমে বের ক'রে দিতে পারি।

অনেক টানাটানি কষাকষির পর পঁচিশ টাকায় রফা হইল। শচীনাথকে কিন্তু আপাতত সেই তেত্রিশ টাকাই দিতে হইল। কেহ এক টাকা, কেহ আট আনা, কেহ বারো আনা, কেহ চারি আনা, কেহবা তাহারও কম ঋণ লইয়া সমস্ত টাকাটা বাহির করিয়া লইল।

যাঁহাদের নূতন বিবাহ, নববধূর আবদার জিনিসটা যে কি, তাঁহারা মর্ম্মে মর্ম্মে জানেন; যাঁহাদের পুরানো হইয়া আসিয়াছে, তাঁহাদেরও দুই-একটা উদাহরণ মনে থাকিতে পারে; সুতরাং এ বিষয়ে অধিক বলিবার প্রয়োজন দেখি না।

শচীনাথের উপর অনেক হুকুম ছিল। বউটি নিতান্ত ছেলেমানুষ; তাহার আবদারের না আছে একটা বাঁধুনি, না আছে কিছু। বাড়িতে থাকিতে বেচারা পতিদেবতাটিকে কি কি ঝক্কি সামলাইতে হয়, সেসব কথা ছাড়িয়া দিই; আপাতত এইটুকু বলিলেই চলিবে যে, বাড়ি ছাড়িবার সময় হুকুম হইয়াছিল যে, এক বর্ষার দিন ছুটি লইয়া আসিয়া বধূর হাতের খিচুড়ি খাইয়া যাইতে হইবে এবং আসিবার সময় একখানা প্রেমপত্রাবলী ও মিত্তিরদের মেজোবউয়ের মত কলম, চিঠির কাগজ আর খাম সঙ্গে আনিতে হইবে।

দুই-তিনটা বর্ষা কাটিয়া গিয়াছে। বেচারা নিজের অসুখ, মৃত ঠাকুরমা মৃত্যুশয্যায়—সব রকমেরই দরখাস্ত দিয়া হারিয়া গিয়াছে। বধূটির পত্র আসিয়াছে; এক টুকরা ছেঁড়া শ্রীরামপুরী কাগজের এক পৃষ্ঠে লেখা। তাহার অপর পৃষ্ঠে এক ইঞ্চি সাইজের অক্ষরে স্কুলের জন্য হাতের লেখা রহিয়াছে। মাস্টারের দস্তখত-সুদ্ধ। পত্রের শেষে পুনশ্চ করিয়া লেখা আছে—"দেখছ? সত্যিই আমার কাগজ নেই। তাই ছোটঠাকুরপোর ইস্কুলের খাতা ছিঁড়ে কাগজ নিয়েছি। আচ্ছা, তুমিই বল না—এ কাগজে কি বরকে লেখা চলে? আমার যেমন কপাল!"

চিঠিটা পাইয়া অবধি শচীনাথ যেন বিপন্নভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। 'আমার যেমন কপাল'—আহা, কথাটাতে যেন ছোট্ট বুকখানির সমস্ত

বেদনা উজাড় করিয়া ঢালা। আবার আসিবার সময় সেই মিনতি-অভিমান-আবদার-মাখানো কচি মুখখানি মনে পড়ে। তাহার পর চিঠিখানিতে পাঁচ জায়গায় শুধু একবার যাইবার ফরমাশ; তাহাতে আবার নানান রকমের প্রায় গোটা দশেক শপথ দেওয়া। বিপদ কি আর গাছে ফলে?

এ অবস্থায় নানা চিন্তার পর সাধারণ যুবক যাহা স্থির করে, শচীনাথও সেইরূপই স্থির করিয়া বসিয়া আছে অর্থাৎ সে দুই-এক দিনের মধ্যে যাইবেই।

চাকরি যায়? অমন শ্বশুর রহিয়াছে কি করিতে? আর নূতন বিয়ের কাছে চাকরি? হুঁঃ!

এই রকম গোছের প্রশ্নোত্তরে এই রকম মীমাংসা করিয়া আজ তাহার মনটা অনেক হালকা ছিল, তাই অল্প চাপের উপর নোট কয়খানা টেবিলের উপর খসখস করিয়া বিছাইয়া দিয়া তদুপরি তিনটা টাকা ঠনঠন করিয়া বাজাইয়া দিল।

ভজহরির হাতে এ মাসের ম্যানেজারি ছিল। দুইখানা পাঁচ টাকার নোট তুলিয়া লইয়া বলিল, মৃত্যুঞ্জয়বাবু থাড়ি-মসুরের ডাল আর তরি-তরকারিগুলো কিনে নিয়ে আসুন—হিসেবী লোক; আর কেউ গিয়ে হগ সাহেবের বাজার থেকে ভাল টেবিল-রাইস, বাছাই করা বোম্বাই-আম, ঘি, সের-কয়েক গলদা-চিংড়ি আর পাউণ্ড-দশেক গ্র্যামফেড মটন কিনে নিয়ে আসুন না; বাজে জায়গা থেকে ভুষি মাল কিনে আনা—সে আমার ম্যানেজারিতে হতে দোব না। আমি দই আর সন্দেশের ভার নিচ্ছি; সব বোঝা আমার ঘাড়ে চাপালে চলবে কেন? আর গণপতি—

গণপতি গুলি পাকাইতেছিল; তাহার স্বভাব-উগ্র চোখে চাহিয়া বলিল, হ্যাঁ, গণপতি কি? ব'লে ফেল।

ভজহরি সামলাইয়া লইয়া বলিল, না, এই তোমার গিয়ে, বলছিলাম —তোর আর এই দুর্য্যোগে কোথাও বেরিয়ে কাজ নেই।

কুলদা বলিল, গ্র্যাম্‌ফেড মটন হ'লে আমি কোর্ম্মা রাঁধবার ভার নিচ্ছি,—একবার দেখাব আজ।

গণপতি সকলকেই তুই-তোকারি করে, ঘুরিয়া বলিল, আবার তুই ঢুকিস তো রান্নাঘরে তোর সেই বীরভদ্র কেতাবটা নিয়ে, তোকে তা হ'লে আর আস্ত রাখব না। সেদিনকার পাঁঠার শোক আমার যায় নি। যতক্ষণ রান্না হবে, তুই ঘরে ব'সে—কি বলে গিয়ে—

পাশ থেকে কে হুকুমের টোনে কথাটা পূরণ করিয়া দিল, বউকে চিঠি লিখতে থাকবি।

শচীনাথ কি ভাবিতেছিল, বলিল, হগ সাহেবের বাজারের দিকে না হয় আমিই যাব, একটু কাজ আছে আমার ওদিকে।

গণপতি বলিল, আটকে যাবি না তো? কেউ সঙ্গে যাক না?

শচীনাথ একটু অন্যমনস্কভাবে বলিল, না, পাঁচ মিনিটের কাজ। সঙ্গে যেতে হবে না, একটা কুলী ক'রে নিয়ে আসব 'খন।

তাহাই ঠিক হইল। ভজহরি বলিল, দেখবেন, বৃষ্টি হ'লে বরং একটা ট্যাক্সি ক'রে নেবেন। আপনি না আসা পর্য্যন্ত সমস্ত বন্ধ থাকবে। আজ আবার ঠাকুরের সেই শ্বশুর-বেটা আর শালাটা এসেছিল; অনুরোধে প'ড়ে ঠাকুরকে তাদের জন্যে দুটি ভাত ফুটিয়ে নিতে হুকুম দিয়েছিলাম—বেটারা পনরোজনের ডাল-ভাত সাবড়ে সটকে পড়েছে—থাকলে পুলিসে হ্যাণ্ডওভার করতাম। মাসের শেষ—হদ্দ কাল সকাল পর্য্যন্ত চাল হ'ত—এখন মুঠো-কয়েক প'ড়ে আছে। আর সবাইয়ের পকেটের অবস্থা তো দেখলেনই—কালও আপনারই ভরসা।

শচীনাথ ফীস্টের দরুন নোট হইতে দশ টাকার দুইখানা নোট আর দুইটি টাকা পকেটে পুরিল, বাক্স খুলিয়া আরও একখানা নোট লইল, পাঞ্জাবিটা গায়ে দিল, আরশির সামনে দাঁড়াইয়া মাথায় দুইটা চিরুনির টান দিল, শ্বশুরবাড়ির জুতাটা পরিল; তাহার পর ছাতা তুলিয়া বাহির হইয়া পড়িল।

তাহার কাজ—বউয়ের জন্য চিঠির কাগজ আর একটা ফাউণ্টেন পেন লইবে।

কুলদা ছাতার কথা বলিতে যাইতেছিল; 'ছা—' করিতেই গণপতি তাহার মুখটা চাপিয়া ধরিল, আবার পেছু ডাকা কেন বাব্বা? একেই তো ওই লোক!

৩

শচীনাথ হনহন করিয়া রাস্তা দিয়া চলিল। মনশ্চক্ষুর সামনে ক্রমাগতই বধূর আবদার-ভরা ঠোঁট-ফোলানো মুখখানি জাগিয়া উঠিতেছে। শচীনাথ কল্পনায় নিজেও কত আবদার, অভিমান, লুকাচুরি করিল—মুখভার আর যায় না। তখন সে মন-ভোলানো কলমটা বাহির করিল। সাহেববাড়ির লেবেল দেওয়া চিঠির প্যাডটা সামনে ধরিল, সোহাগভরে দুইটাকে সোনার হাতে তুলিয়া দিতেই ঠোঁট দুইটি হাসিতে এলাইয়া পড়িল। শচীনাথ একটা চুম্বন বসাইতে যাইতেছিল—অবশ্য কল্পনাতেই, তাহার পূর্ব্বেই একটা বাস্তব ল্যাংড়া-আমের বড় খোলায় পা পড়ায় শান-বাঁধানো ফুটপাথের উপর সড়াৎ করিয়া খানিকটা পিছলাইয়া গেল। ইহাতে মনটা কল্পনালোক হইতে আমাদের মরজগতে ফিরিয়া আসিলে শচীনাথ লক্ষ্য করিল, পথিকদের মধ্যে সকলেই যেন একটু সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে। সামনে চাহিয়া

দেখিল, পশ্চিম দিক ঝাপসা করিয়া প্রলয়বেগে বৃষ্টির ধারা ছুটিয়া আসিতেছে, লাটসাহেবের বাড়ির উপর পর্য্যন্ত পৌছিয়া গিয়াছে, আর মিনিট-খানেকের মধ্যেই ভিজাইয়া দিবে। এতক্ষণে মনে পড়িল, ছাতা আনা হয় নাই, সঙ্গে সঙ্গে এটুকু ভাবিয়াও অস্থির হইয়া পড়িল যে, পকেটে খান-তিনেক নোট।

ধর্ম্মতলা দিয়া আসিতেছিল, মোড় ঘুরিয়া চৌরঙ্গি হইয়া ছুটিল। হোয়াইটঅ্যাওয়ে কোম্পানির দোকানের সামনে যখন পৌছিল, তখন আর অগ্রসর হইবার জো নাই; পথের একটা থাম ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল; আকাশের দিকে চাহিয়া বলিল, খেও সব খিচুড়ি আজকে!

খিচুড়ির কথায় আবার বধূর কথা মনে পড়িয়া গেল। যদিও সবে আষাঢ় মাস পড়িয়াছে, তথাপি এই বিরহ-বিধুর নূতন বরটি ভাবিতে লাগিল, বর্ষা তো হয়ে গেল, আমার খিচুড়ি খাওয়ার নেমন্তন্ন তো এখনও রক্ষা করা হ'ল না! কি করব বল সুরমা, এত পরাধীনের ভগবান কেন যে বিয়ে দেন, জানি না। সেখানেও নিশ্চয় এমনই বর্ষা পড়েছে; অভিমানে চাঁদমুখখানি ভার হয়ে আছে। মিত্তিরদের মেজোবউয়ের মত চিঠির কাগজ চাই? চিঠির কাগজ এমন নিয়ে যাব, মেজোবউ কখনও চক্ষেও দেখে নি, দেখবেও না।

হঠাৎ হুঁশ হইল—সে সবচেয়ে সেরা সাহেবী দোকানের সামনেই দাঁড়াইয়া। ভাবিল, হগ সাহেবের বাজারে গিয়া খরিদ করার চেয়ে এইখানেই লওয়া ভাল হইবে না কি? বাজারের উৎকৃষ্ট জিনিসই যদি প্রিয়ার হাতে তুলিয়া দিতে হয় তো এই তাহার জায়গা। খরচ? হাঁ, তা একটু বেশি পড়িবে বইকি। শচীনাথ একটু ভাবিয়া দেখিবার চেষ্টা করিল; কিন্তু দুইটি জিনিস মনটাকে নিরবশেষ করিয়া জুড়িয়া বসিল—মানের ভরে ঘাড় কাত করা একটি ডবডবে মুখ আর তাহার

পাশে মিত্তিরদের মেজোবউয়ের কাল্পনিক ঐশ্বর্য্য। টাকাটাও শ্বশুরের—স্বভাবতই যাহার জন্য বেশি দরদ থাকে না। শচীনাথ ঘাড় বাঁকাইয়া দোকানের অপূর্ব্ব পণ্যশ্রী খানিকক্ষণ নিরীক্ষণ করিল, তাহার পর গটগট করিয়া ঢুকিয়া পড়িল।

সাহেবের দোকানে এই প্রথম আসা; ভিতরে গিয়া একটু ভ্যাবাচাকা খাইয়া গেল। বাংলায় বেচাকেনা বলিতে হুড়াহুড়ি চেঁচামেচির মধ্য দিয়া যে ব্যাপারটা বোঝায়, তাহার কিছুই দেখিতে পাইল না। বর্ষার জন্য সেদিনে আবার দোকানে খরিদ্দার খুবই কম, কাজেই সচরাচর যেটুকু সজীবতা থাকে, সেদিন তাহারও অভাব ঘটিয়াছিল। রাশি রাশি জিনিস অত্যন্ত নিপুণতার সহিত গোছানো রহিয়াছে, সেগুলাকে স্থানচ্যুত করিয়া কখনও যে বিক্রয় করা হয়—এ কথাটা বিশ্বাস করা শচীনাথের পক্ষে শক্ত হইয়া উঠিল। তখন ধাঁ করিয়া তাহার মনে হইল, বড় দোকান, যদি পাটের কিংবা তিসির গদিয়ানদের মত শুধু পাইকারি বিক্রয়ই করে এরা?

'ন যযৌ ন তস্থৌ' হইয়া এক জায়গায় দাঁড়াইয়া বিহ্বলভাবে চারিদিকে কাতর দৃষ্টি হানিতেছিল, এমন সময় একজন ফিরিঙ্গী আসিয়া প্রশ্ন করিল, কি চাই আপনার?

কলম আর প্যাড।

স্টেশনারি ডিপার্টমেণ্ট; ওই দিকে গিয়ে বাঁ দিকটা ঘুরে যাবেন। আচ্ছা, চলুন, আমিই দেখিয়ে দিচ্ছি।

শচীনাথ পিছনে পিছনে খুচরা-পাইকারির কথাটা ভাবিতে ভাবিতে সন্দিগ্ধ মনে চলিল।

স্টেশনারি ডিপার্টমেণ্টের চার্জে একজন যুবতী। ফিরিঙ্গী শচীনাথকে দেখাইয়া বলিল, একজন খদ্দের তোমার।—বলিয়া ধন্যবাদ লইয়া চলিয়া

যাইতেছিল ; একবার ঘুরিয়া হাসিয়া বলিল, আমার কমিশন চাই কিন্তু, মনে থাকে যেন।

মেয়েটি কৃত্রিম রাগ দেখাইয়া বলিল, দুষ্টু কোথাকার!—বলিয়া স্মিত মুখে শচীনাথের দিকে চাহিল। বর্ষায় আজ সমস্ত দিন এক রকম তাহার বিভাগে বিক্রয় নাই ; তাহার উপর এই যুবক খদ্দেরটিকে বেশ শাঁসালো বলিয়া বোধ হইল। ঘাড় হেলাইয়া বলিল, এগিয়ে আসুন, কি চাই আপনার ?

বোধ হয় ইহুদী ; ঢলঢলে দুইটি কালো চোখ। কালো কোঁচকানো ঘন চুল, হালফ্যাশানে কানের কাছে ঘোরানো জুলফি করিয়া ছাঁটা। বেশি করিয়া ধরিলে বছর আঠারো কি উনিশ বয়স হইবে। সমস্ত শরীরটি এবং গতিবিধির মধ্যে একটি বেশ সুললিত স্বচ্ছন্দ ভাব মাখানো। চোখটা একবার পড়িলে ইচ্ছামতই সরাইয়া লওয়া যায় না।

শচীনাথ একটু অগ্রসর হইয়া আসিয়া বলিল, একটা ফাউণ্টেন পেন আর একটা প্যাড চাই।

দিই ; আপনি ততক্ষণ এই চেয়ারটায় বসুন, ফ্যানটাও খুলে দিই এই।

কথাবার্ত্তা অবশ্য ইংরেজীতেই হইতে লাগিল। ইচ্ছা করে, মেয়েটির মিষ্টি মিষ্টি ইংরেজী উদ্ধৃত করিয়া পাঠককে উপহার দিই ; কিন্তু তাহা হইলে তাহার সঙ্গে শচীনাথের পেটেণ্ট ইংরেজীও তুলিয়া তাঁহাদের বিড়ম্বিত করিতে হয় ; সুতরাং বাংলাতেই তর্জ্জমা করিয়া দিতেছি—

আগে কলম দেখাই ; কি রকম ধরনের কলম চাই বলুন তো ?

বধূর পদ্মকোরকের মত মুষ্টিতে কি রকমটি মানাইবে, শচীনাথ একটু কল্পনা করিয়া বলিল, একটু দেখতে শুনতে বাহারে হয়—

মেয়েটি খোলা কাঁধের উপর জামার পটি তুলিয়া বসাইয়া দিয়া একটু জেরা শুরু করিয়া দিল, নিজের জন্যে, না উপহার ?

শচীনাথ একটু সঙ্কোচের সহিত বলিল, না, উপহারের জন্যে।

মনিবকে, না বন্ধুকে ?

নববধূ কিসের পর্য্যায়ে পড়ে, একটু দেরি করিয়া মনে মনে তাহার মীমাংসা করিয়া শচীনাথ বলিল, না, মনিব না, এই এক রকম বন্ধুকেই।

পুরুষ, না স্ত্রীলোক ? মেয়েটি এখানে নিজেও একটু লজ্জায় রাঙিয়া উঠিল।

শচীনাথ বলিল, স্ত্রীলোককেই ; বস্তুত আমার স্ত্রীর জন্যেই কিনতে এসেছি।

মেয়েটি উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। একটু অভিমানের সুরে বলিল, দেখুন তো, তা এতক্ষণ বলতে হয়। আমায় উকিলের অভিনয় করিয়ে ছাড়লেন আপনি। ফিস চাই কিন্তু—হি-হি-হি—। নিশ্চয়ই টুকটুকে ছোট্ট একটি মেয়ে সে। তার জন্যে জিনিস পছন্দ করা তো আপনার এলাকা নয়। আমি নিজে যা পছন্দ ক'রে দোব, তাই নিয়ে যাওয়া উচিত। আচ্ছা, দামের একটা আন্দাজ—

শচীনাথের দামের বিশেষ একটা আন্দাজ ছিলই না ; যাহা কিছু ছিলও বা, সেটুকু পর্য্যন্ত এই সুন্দরীর কথাবার্ত্তা হাবভাবের স্রোতে ভাসিয়া গিয়াছিল। মুখের দিকে হাঁ করিয়া চাহিয়া দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে বলিল, এই একটু বাহারে, মানানসই—

মেয়েটি ছোট্ট মাথাটি দুলাইয়া একটু হাসিয়া বলিল, ঠিক ঠিক, মেয়েটি স্বামীভাগ্যে খুব ভাগ্যবতী দেখছি।

শচীনাথ একটু ফুলিয়া উঠিল। ভাবিল, এই প্রশংসার বাণীটি—

আবার এমন একখানি মুখের বাণী—যদি একবার বধূর কানে উঠিত, তবে তো—

টেবিলের উপর কাগজের, ইমিটেশন লেদারের নানান রকম কেসে গোটা দশ-বারো কলম আসিয়া পড়িল। মেমসাহেব সুভঙ্গিম অঙ্গুলি দিয়া সেগুলা একে একে খুলিয়া সাজাইয়া দিল। রোল্ড গোল্ডের, রূপার, সেলুলয়েডের—কালো, বাদামী, সোনার ব্যাণ্ড আর ক্লিপ আঁটা চমৎকার চমৎকার জিনিস সব। দুইটা কম-দামী, এ মজলিসে হংসো মধ্যে বকো যথা গোছের, কলমও ছিল। সে দুইটা যুবতীর স্পর্শসুখও ভাল করিয়া পাইল না।

শচীনাথ বিলাতী সোনার একটা কলম উঠাইয়া লইয়া বলিল, এটা কত?

পঞ্চান্ন টাকা; তবে আজকাল গ্র্যাণ্ড ক্লিয়ারেন্স সেল চলেছে, চুয়ান্ন টাকা পনরো আনাতে পাবেন। উপহারের পক্ষে এমন—

পঞ্চান্ন টাকা! শচীনাথের গলগল করিয়া কালঘাম ছুটিল। এই রকম দামের জিনিস সব বাহির করিয়াছে! সর্ব্বনাশ! পকেটে তাহার বত্রিশটি টাকা পড়িয়া। তাহার মধ্যে আবার, এতক্ষণ স্বর্গবাসে যে কথা সে বিলকুল ভুলিয়া গিয়াছিল, বাইশটা টাকা ফীস্টের দরুন। সে বেচারীরা তীর্থের কাকের মত হাঁ করিয়া বসিয়া আছে।

শচীনাথ ফ্যালফ্যাল করিয়া মেয়েটার দিকে অনেকক্ষণ চাহিয়া রহিল। একবার মাথার উপর পাখাটা ঠিক ঘুরিতেছে কি না দেখিয়া লইল। তাহার পর কলমটা রাখিয়া দিয়া আমতা আমতা করিয়া বলিল, ইয়ে—আর কিছু না—তার হাতের পক্ষে এটা নেহাত বড় হবে।

মেয়েটি রোজ এই কাজ করিতেছে। বিজ্ঞের মত গম্ভীর হইয়া

বলিল, আমিও ঠিক সেই কথা বলতে যাচ্ছিলাম ; তবে আপনি নেহাত তুলে নিলেন। আচ্ছা, এইটে দেখুন তো। ওরই জুনিয়ার, হাতে ঠিক মানাবে। কত বয়স? চোদ্দ? হয়েছে। আচ্ছা বলুন তো, রঙটা আপনার মত, না কালো?

শচীনাথ যেন অকূলে কূল পাইল। সে নিজেই বেশ কালো, বধূটি ঢের ফরসা। তথাপি রঙটা কালো বলিলে যদি এ যাত্রা পরিত্রাণ পাওয়া যায়। এ মোহিনীর মতে কালোর হাতে যদি খেলো কম-দামী জিনিসই মানানসই হয়—এই ভাবিয়া বলিল, না, আমার চেয়ে বেশ একটু কালোই হবে।

সে যে আবার কি বস্তু, তাহা ভাবিয়া চতুরা যুবতী একটি ছোট্ট হাসিকে ঠোঁটে চাপিয়া মিলাইয়া লইল ; তাহার পর একটু চিন্তিতভাবে বলিল, তা হ'লে আপনাকে এই সোনারটিই নিতে হয়। কালো হাতে রূপোর জিনিসও মানাবে না, বাদামী সেলুলয়েড তো নয়ই ; আর কালো? তা হ'লে আপনার স্ত্রী আপনাকে কখনই ক্ষমা করতে পারবেন না ; এ তাঁকে সাংঘাতিক বিদ্রূপ করা হবে (It will be nasty joke at her expense)।

যাঃ, একেবারে উল্টা উৎপত্তি! মিথ্যাটা যেন ফণা ঘুরাইয়া তাহাকে একটা ছোবল দিল। যদিও বুঝিল, সত্য কথা বলিলেও মেমসাহেবের রায়টা সোনার কলমের দিকেই বাহাল থাকিত, তথাপি তাহার অনুতাপ-দুর্ব্বল মনে একটা খটকা লাগিয়াই রহিল—বোধ হয় ফরসা বলিলেই নিষ্কৃতি পাওয়া যাইত। আ-হা-রে!

মেসে সে বেচারারা এতক্ষণ মিনিট গুনিতেছে। এ জাঁতিকল হইতে পরিত্রাণের কোন উপায়ই না দেখিয়া শচীনাথ ছটফট করিতে

লাগিল। হতাশায় মরিয়া হইয়া নিকৃষ্ট কলম দুইটার মধ্যে একটা তুলিয়া লইয়া বলিল, এটা কেমন হবে ?

মেয়েটি শচীনাথের ফিটফাট বেশভূষার দিকে একটা সসম্ভ্রম দৃষ্টি বুলাইয়া অপরাধিনীর মত বলিল, ওটা আমায় দিন, এ দুটো আপনার যোগ্য নয়। পাঁচ-সাত টাকা দামের নেহাত খেলো জিনিস—বের ক'রেই আপনার প্রতি অন্যায় করেছি, সেজন্যে ক্ষমা করবেন।

বেটাছেলে হইলে শচীনাথ বোধ হয় ঘুষি মারিয়া বসিত, অন্যায় করিয়া ফেলার জন্য নহে, তাহার প্রতি এই সৌজন্য দেখানোর জন্য। যুবতীকে শুধু বলিল, না না, সে কি কথা! আপনি দয়া ক'রে এত আগ্রহ প্রকাশ করেছেন আমার জন্যে—

যাদুকরী সুগন্ধি একটি রুমাল বাহির করিয়া কপালের উপর উড়িয়া পড়া একটা চুলের স্তবক মাথার উপর তুলিয়া দিয়া বলিল, আপনার অভিমতের জন্যে ধন্যবাদ। আমাদের কর্ত্তব্যই খদ্দেরের জিনিস-মননে যথাসাধ্য সাহায্য করা। তার ওপর জিনিসটা আপনার বালিকা-বধূর জন্যে যখন শুনলাম, তখন আমি আপন ভুলেই একটু অধিক আগ্রহ দেখিয়ে ফেলেছি। যদি অপরাধ হয়ে থাকে—হ্যাঁ, দামটা—অর্থাৎ সেল প্রাইস আটাশ টাকা চার আনা। কৌটায় বন্ধ করিয়া কলমটা সে শচীনাথের সামনে সরাইয়া দিল।

৪

একটা চলিত কথা ব্যবহার করিতেছি—শচীনাথ একেবারে ভেড়া হইয়া গিয়াছিল। কোনমতেই সে এই যাদুশক্তির বিরুদ্ধে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে পারিতেছিল না। ফীস্টের ব্যাপারটা খুবই স্পষ্ট করিয়া মনে পড়িল। অত্যন্ত ইচ্ছা হইল, ছুটিয়া দোকান হইতে বাহির হইয়া

যায়, কিংবা কম-দামী কলমের মধ্যে একটা খুব মনের জোর দিয়া আবার তুলিয়া লয়; অথবা অন্ততপক্ষে এ অমানুষিক অত্যাচারের জন্য দুইটা কড়া কথা শুনাইয়া দিয়া মনটা হালকা করিয়া লয়। কিন্তু কার্য্যত সেসব কিছুই না করিয়া ভালমানুষের মত পকেট হইতে তিনখানা নোট বাহির করিয়া দিল। কথাটা কি খুব আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে?

যুবতী হাসিয়া বলিল, মিসেস—মিসেস—

শচীনাথ বলিল, হালদার।

মিসেস হালদারকে বলবেন, এমন সুন্দর পছন্দ তাঁর স্বামীর যে, তাঁকে কন্‌গ্রাটুলেট না ক'রে থাকতে পারলাম না। হ্যাঁ, একটা প্যাড? সেটাও তাঁরই জন্যে নাকি?

শচীনাথ ঢের মিথ্যা কথা বলিয়াছে; কিন্তু খুব প্রয়োজন হইলেও এ ক্ষেত্রে পারিল না। বলিল, হ্যাঁ, তারই জন্যে; তবে প্যাড আপাতত না হ'লেও চলে।

যুবতী আবদারের জবরদস্তি দেখাইয়া মাথাটি একটু দুলাইয়া বলিল, না নেন, দাঁড়িয়ে একটু দেখুনই না; অবশ্য যদি আমার এ কোণটুকু আপনার নেহাত অপ্রীতিকর ব'লে না বোধ হয়।

রঙ-বেরঙের পাঁচ-ছয়খানা প্যাড আসিয়া পড়িল। শচীনাথ কলমের যোগ্য ভাল ভাল তিনখানা উঠাইয়া লইল—এর আর কতই মূল্য হইবে? জিজ্ঞাসা করিল, দাম এগুলোর?

এক টাকা চার আনা, এক টাকা বারো আনা, আর এটা দু টাকা ছ আনা। শেষেরটার পাতা খুলিয়া সামনে আগাইয়া দিয়া বলিল, এর কাগজটা একবার দেখছেন? একেবারে নতুন জিনিস; ভারতবর্ষে আমরাই প্রথম আমদানি করেছি—আপনাদের মত অভিজাতদের জন্যে।

শচীনাথ দেখিল, প্যাডেও তো বিপদ সামান্য নয়, অন্তত ইহার কাছে। সে ভাবিয়াছিল, যেখানে আটাশ টাকা লম্বা হইয়া গেল, সেখানে না হয় আরও গণ্ডা বারো-চোদ্দ, কি জোর একটা টাকাই যাইবে; বিশেষ করিয়া যখন কলমের সঙ্গে সঙ্গেই প্যাডের ফরমাশটা দিয়া ফেলিয়াছিল। তা নয়, কোথায় আড়াই টাকার একটা প্যাড! তাহাকে যেন পাইয়া বসিয়াছে বেটী!

শচীনাথের প্রপিতামহ একজন বিচক্ষণ মোক্তার ছিলেন; বোধ হয় সেই উত্তরাধিকারসূত্রে তাহার মাঝে মাঝে একটা আশ্চর্য্য রকম কূটবুদ্ধি যোগাইয়া যাইত। ইহার আগে যোগায় দেশে—একটা দুরন্ত হনুমানকে জব্দ করিতে। শচীনাথের ডান হাতের পেশীতে এবং বাঁ দিকের পাঁজরায় এখন পর্য্যন্ত তাহার নিশানা আছে। এর চেয়ে ভাল প্যাড তো ইহার ভাঁড়ারে নাই। মনে মনে কহিল, এইবার তোমায় আমার কাছে হারতে হবে চাঁদ।

বলিল, এ প্যাডটার প্রশংসা করতে হয়; তবে আমি খুঁজছি এর চেয়ে সেরা জিনিস—দাম আর একটু বেশি হ'লেও ক্ষতি নেই। একবার আর্মি-নেভির ওখান থেকে এক জোড়া কিনেছিলাম—চীফ জাষ্টিসের স্ত্রীকে ভেট দেওয়ার জন্যে। এটা রেখে দিন, সেইখানেই একবার দেখি গিয়ে। আমার তা হ'লে হ'ল—তিরিশ থেকে আটাশ টাকা চার আনা গেলে—

মেয়েটি উৎসাহদীপ্ত চোখে শচীনাথের দিকে চাহিয়া বলিল, একটু অপেক্ষা করুন মিঃ হালদার; আপনাকে আমার ডিপার্টমেণ্ট থেকে নিরাশ হয়ে ফিরতে হবে না। ক্ষমা করবেন, আপনার মত শৌখিন লোকের প্রতি অবিচার করেছি। আসি, দাঁড়ান—

আচ্ছা, এ দুটো পরখ করুন তো; নিশ্চয় এই জিনিসের কথাই

বলছিলেন আপনি।—বলিয়া দুইখানি নূতন ধরনের প্যাড শচীনাথের হাতে তুলিয়া দিয়া টেবিলে ভর দিয়া দাঁড়াইল; সফলতার আনন্দে মুখখানি রাঙা হইয়া উঠিয়াছে।

শচীনাথের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমিয়া উঠিল এবং সে অবসন্ন-ভাবে সামনের টেবিলটায় একটু ঝুঁকিয়া পড়িল। পাপ কলিতে ধরণী আর দ্বিধা হয় না। শচীনাথ মনে মনে বলিল, হে অট্টালিকা, তুমি ভেঙে পড়—তোমার এই ঐশ্বর্য্যের মায়াজাল নিয়ে তুমি মর, সম্মোহনের সহস্র বিদ্যা নিয়ে এই মায়াবিনী মরুক, আর মোহমুগ্ধ পদার্থ-লেশহীন আমিও মরি। হায় রে, ভেবেছিলাম, অন্তত চালটা কিনে নিয়ে যাব; বলব, মটন গলদা-চিংড়ি ওসব্ পাওয়াই গেল না। কি কুক্ষণেই যে—

যুবতী দেহলতাটিকে একটু দোলা দিয়া বলিল, কেমন, যা খুঁজছেন তাই নয় কি? দেখতে হবে না, আসল মরক্কো চামড়া, ও ক্লিপটা চোদ্দ ক্যারেট সোনা। প্যাডের কাগজগুলো যখন ফুরিয়ে যাবে, অন্য প্যাড কিনে—আঃ, কি জ্বালা! দেখুন তো মিঃ হালদার, চুলের সঙ্গে কানের দুলের কি চিরকালই শত্রুতা থাকবে? আমি তো আর এদের মধ্যস্থতা ক'রে উঠতে পারি না।—বলিয়া গ্রীবা বাঁকাইয়া দুল আর চুলের জট খুলিতে লাগিল। আর কোন উত্তর না পাইয়া ভাবিতে লাগিল, লোকটা কি বেরসিক রে; ইউরোপীয়ানদের সঙ্গে এদের এইখানেই তফাত।

শচীনাথ বেচারার চক্ষে তখন পৃথিবীর সব সৌন্দর্য্যই নিবিয়া গিয়াছিল। শুষ্ক কণ্ঠে বলিল, কত দাম?

গ্র্যাণ্ড ক্লিয়ারেন্স সেলে তিন টাকা সাত আনা, তিন টাকা নয় আনা। কোন্‌টা দিই?

শচীনাথ নিজের উপর বিজাতীয় রাগে তিন টাকা নয় আনাটা

বাড়াইয়া দিল। পকেটের টাকা দুইটা বাহির করিয়া দিয়া অস্পষ্টভাবে বাংলায় বলিল, ক্লিয়ারেন্স সেলটা কি আমার পকেট লক্ষ্য ক'রে? গাঁটকাটা সব, ডাইনী!

যুবতী ক্যাশ-মেমোর উপর তিন আনা পয়সা রাখিয়া সামনে ঠেলিয়া দিয়া বলিল, তা হ'লে আপাতত আসুন বাবু, নমস্কার।

৫

বাহিরে আসিয়া শচীনাথ একটা সুদীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিল, তাহাতে তাহার বুকটা যেন পকেটের মতই খালি হইয়া গেল। ভাবিল, এখন উপায়?

অত্যন্ত ক্রোধ হইল, প্রথমত মেয়েটার উপর, কিসের জন্য সে শয়তানী অমন করিয়া—

কিন্তু অমন করিয়া কি, তাহার কোন স্পষ্ট আকার না পাইয়া আরও চটিয়া উঠিল। একেবারে সপ্তমে উঠিল, যখন মনের এক কোণে আবার তাহার বিবেকটা মুরুব্বিয়ানা করিয়া বলিল, কই, সে বেচারী তো মাত্র নিজের কর্ত্তব্য—

শচীনাথ এই ক্ষীণ আওয়াজটুকু চাপিয়া দিয়া বলিল, কিছু না! আমি ওকে দেখে নোব একবার। ইহাতে একটু সান্ত্বনাও পাইল; আর রাগ হইল নিজের উপর। এমনই লক্ষ্মীছাড়া, কাণ্ডজ্ঞানহীন তুই! এতবড় একটা আমোদের ভার—! চুলোয় যাক আমোদ, অন্তত রাত্রে সবাইকে এক মুঠো ক'রে গিলতে তো হবে, আর তুই কিনা একটা তুচ্ছ মেয়ের—আরে ছ্যাঃ, ছাই সুন্দরী!

সবার শেষের ঝোঁকটা গিয়া পড়িল বউয়ের উপর। কি ভীষণ স্বার্থপর আর অবুঝ এরা! একটা সামান্য কলম আর খানকতক চিঠির

কাগজের জন্যে সময় নেই অসময় নেই—ঘ্যানর ঘ্যানর! শেষে একটা অঘটন ঘটিয়ে তবে ছাড়লে! মুখ তোলো হাঁড়ি তো হয়েই রয়েছে। 'এ কাগজে কি বরকে লেখা চলে? আমার যেমন কপাল!' কেন, তোমার কপাল তো ঠিকই আছে; লক্ষ টাকা দামের কাগজ কলমে দাগড়া দাগড়া অক্ষরে কাঁদুনি গাইবে 'খন। কপাল পোড়া এই অভাগা বেটাছেলেগুলোর। সাতজন্মে কেউ যেন বিয়ে না করে।

এখন মেসে ঢুকিবে কি করিয়া সেই এক মহাচিন্তা। আষাঢ়ান্ত বেলা, এখনও একবার ট্যাক্সি করিয়া গিয়া টাকা লইয়া ফিরিয়া আসিবার সময় আছে; কিন্তু যাওয়ার নামেই তাহার বুকটা গুরগুর করিয়া উঠিল। মটন, ঘি, আম, টেবিল-রাইস আর গলদা-চিংড়ির বদলে যখন সে মরক্কো লেদারে বাঁধা প্যাড আর আটাশ টাকা দামের সোনার কলম লইয়া উঠিবে, তখন প্রথম ঝোঁকটা সেই পনরোটা হন্যে কুকুরের হাতে তাহার কি নাকালটাই হইবে ভাবিয়া সে দমিয়া গেল। কিন্তু এ ভিন্ন আর উপায়ও নাই। শচীনাথ পাশের একটা দোকানে গিয়া বড় এক গ্লাস শরবত পান করিল, তাহার পর আসিয়া আবার পর্চের নীচে দাঁড়াইল। প্রায় আধ ঘণ্টা তিন কোয়ার্টার চিন্তা করিয়াও কোন জুতসই মতলব স্থির করিতে পারিল না। অবশেষে হার মানিয়া একটা ট্যাক্সি ডাকিতে যাইবে, এমন সময় হঠাৎ তাহার বাল্যবন্ধু নন্দের কথা মনে পড়িয়া গেল।

এই মিড্‌ল্টন স্ট্রীটে বাড়ি তাহার। বড়মানুষের ছেলে, এক কথায় পঞ্চাশ টাকা বাহির করিয়া দিতে পারে। ভাবিল, কেন যে কথাটা এতক্ষণ মনে পড়ে নাই!

দুর্ভাবনাটা কাটিয়া গিয়া শরীরটা অনেকটা হাল্কা হইল। কলমটা এবং প্যাডটার উপর দরদ জমিয়া উঠিল; যে বিক্রয় করিয়াছে, তাহার

সুন্দর সরল মুখখানি মনে পড়িল; আর যাহার জন্য কেনা, সে তো আবার হৃদয়-সিংহাসনে রাণী হইয়া জাঁকিয়া বসিলই। মনটা রসিকতা করিয়া নিজের প্রশ্নের নিজেই জবাব দিল, দু-দুটো সুন্দরীর পাল্লায় পড়েছ, বন্ধুদের কথা কি মনে থাকে?

বৃষ্টিটা একটু ধরিয়াছিল, শচীনাথ উৎসাহভরে বাহির হওয়ামাত্রই আবার মুষলধারে নামিল। বেচারী ফিরিয়া আবার আশ্রয়ে ঢুকিল ও ঝাড়া এক ঘণ্টা পরে বাহির হইয়া আসিয়া ডান হাতে প্যাড এবং বাঁ হাতে জুতাজোড়াটা ও কোঁচা তুলিয়া ছপাৎ ছপাৎ করিয়া চলিল, এবং আরও গোটা দুই-তিন মাঝারি-গোছের বর্ষণ কাটাইয়া রাত প্রায় আটটার সময় নন্দের বাড়ির ফটকে গিয়া প্রবেশ করিল।

বাড়ির দরোয়ান রামবৃছ দুবে বর্ষাজনিত ভাবুকতার উচ্ছ্বাসে দক্ষিণ কর্ণের উপর হাত চাপিয়া ও বাম চক্ষুটা প্রাণপণে বুজিয়া, হাঁ—আঁ—আঁ করিয়া সবেমাত্র তাহার ছাপরেয়ে মল্লারের তান উঠাইতে যাইতেছিল, শচীনাথকে দেখিয়া হঠাৎ থামিয়া গিয়া বলিল, আরে আঁই আঁই, শচনাথবাবু, আজকে ইন্দির মহারাজ গোসসা হয়েছে, বাঙালী মাশাদের অমরাবত্তীকে পাতালে সেঁদিয়ে দিবে। আর নন্দবাবু কোথা আছে? কেমোন খাওয়া-দাওয়া বোনলো? নয়া শাদি করলে, গরিব রামবৃছের বকশিশ—

শচীনাথ ভীতভাবে বলিল, নন্দবাবু? নন্দবাবু যাবে কোথায়? বাড়িতেই আছে।

রামবৃছ তাহার সমস্ত দন্তপাটি বিকশিত করিয়া কহিল, হেঁ-হেঁ, আছে বইকি, রামবৃছের কাছে চালাকি? সে তো তোমার বাড়ি বর্ষার নেওতা খেতে গেছে। হেঁ-হেঁ, আমার সামনেই তো সে আর লগীনবাবু মতলব ঠিক করলে; আমাকে ফাঁকি দিতে আছো বাবু?

শচীনাথ কাঠ হইয়া গিয়াছিল, তাহার এদিকে মনই ছিল না, কোনও উত্তরই দিল না। কি কুক্ষণেই তাহার নন্দের কথা মনে পড়িয়াছিল! এতক্ষণে সে বাড়ি হইতে টাকা আনিয়া জিনিসপত্র লইয়া ফিরিয়া যাইতে পারিত। কি কুগ্রহই পড়িয়াছে আজ! ওরে লক্ষীছাড়া নন্দ, শেষ চোটটা তা হ'লে তুইই দিলি রে!

এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল খাওয়াতে পার দুবেজী?—বলিয়া সে হতাশ-ভাবে চিন্তা করিতে লাগিল।

নিরাশার অন্ধকার যখন নিতান্ত ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছে, শচীনাথ মনের এক কোণে যেন একটা ক্ষীণ আলোক অনুভব করিল। বুঝিল, এ সেই তাহার প্রপিতামহের মোক্তারী বুদ্ধির সূক্ষ্ম রেখা, তাহার জন্মগত সংস্কার। আলোটি ক্রমে বেশ স্পষ্ট হইয়া উঠিল এবং জলটা যতক্ষণে পান করিল, ততক্ষণে বেশ একটা চতুর প্ল্যান সেই আলোর মধ্যে রেখায় রেখায় ফুটিয়া উঠিল।

গ্লাস রাখিয়া শচীনাথ দরোয়ানকে বলিল, রামবৃছ দুবের বকশিশটা অনেকদিন থেকে প'ড়ে আছে, না? আচ্ছা, কাল একবার ফুরসৎ ক'রে সন্ধ্যার সময় মেসে যেও। হ্যাঁ, আর দেখ, যাবার সময় এই মোড়াটা হাতে ক'রে নিয়ে যেও, কি জানি বৃষ্টিতে ভিজে যেতে পারে। আর দেখ, নন্দ কি বাড়ির আর কাউকে মোড়াটা দেখিয়ে কাজ নেই, আর ব'লেও কাজ নেই যে, শচীনাথ এসেছিল। এর মধ্যে একটু মজা আছে, তুমি সমঝদার লোক, নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ?

রামবৃছ অসমঝদার হইয়া পড়িবার ভয়ে কোন প্রশ্ন না করিয়া সেয়ানার মত ঘাড় দোলাইয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, সে আমি জবান কাটিয়ে দিলেও বোলবে না।

তা হ'লে কাল বকশিশটা নিয়েই এস। কই, তোমার ছাতাটা দেখি একবার, কাল নিয়ে এস 'খন।

হ্যাঁ, এই বর্ষার ঠিক এই ছাতা, বাঃ!

ফটক পর্য্যন্ত জুতা-পায়ে আসিয়া শচীনাথ আবার জুতা খুলিয়া পূর্ব্ববৎ চলিল। হগ সাহেবের বাজারে যেখানে মটন কিনিবার কথা, তাহারই কাছাকাছি একটা মনিহারী দোকানে গিয়া প্রশ্ন করিল, একটা ছোট কাঁচি পাওয়া যাবে?

সমস্ত দিন বর্ষার জন্য বিক্রয়াদি না হওয়ায় দোকানী অনির্দ্দিষ্টভাবে সারা দুনিয়ার উপর এবং নির্দ্দিষ্টভাবে খদ্দের জাতটার উপর চটিয়া ছিল।

দু আনা দেবেন।—বলিয়া একটা এক আনা দামের মোড়া কাঁচি বাহির করিয়া দিল।

শচীনাথেরও আজ দোকানী জাতটার সঙ্গে বাক্যালাপ করিবার মেজাজ ছিল না; দুই আনা পয়সা ফেলিয়া দিয়া কাঁচিটা লইয়া বাহিরে আসিল এবং মেসের রাস্তা ধরিল।

মাঝামাঝি আসিয়া একটা কেরোসিন-ল্যাম্প-জ্বালা নির্জ্জন গলির মধ্যে প্রবেশ করিল এবং তাহারও মধ্যে যেখানে বেশ জমাট-গোছের অন্ধকার ছিল, সেখানটায় গিয়া দাঁড়াইল। বুকের ভিতর তাহার এমন ধড়াস ধড়াস করিতেছিল, যেন সদ্য খুন করিয়া ফেরার হইয়াছে।

একবার এদিক ওদিক চাহিল, তাহার পর বাঁ হাতে ডান দিকের পকেটের থলিটা টানিয়া ধরিয়া কাঁচি দিয়া কচকচ করিয়া এপার ওপার করিয়া দিল।

ঠিক এই সময় পাশের বাড়ির দরজা খোলার শব্দ হইল এবং শব্দকর্ত্তা বাড়ির মালিককে বলিতে বলিতে বাহির হইয়া আসিল, ওহে, কর্পোরেশনকে ব'লে তোমাদের গলিটার একটা কিনারা করতে পারলে

না? একে তো 'কমিট-নো-নুইসেন্স' লিখে নরকের যোগাড় ক'রে তুলেছে, রাত্তিরে যে আবার গাঁটকাটার ভয় করে!

শচীনাথ ত্রস্তভাবে হনহন করিয়া বাহির হইয়া আসিল। তাড়াতাড়িতে কাঁচিটা আর কাপড়ের টুকরাটা যে বাঁ দিকের পকেটেই রাখিয়া দিল, তাহা আর জ্ঞান হইল না।

৬

মেস এদিকে আগুন হইয়া আছে।

মাঝে মাঝে এক-একজন মেম্বরের উগ্র অভিমতের আকারে এক-একটা শিখা উঠিতেছে, কিন্তু সকলেরই পূর্ণ উত্তাপ লইয়া দুরাচার শচীনাথকে দগ্ধ করিবার ইচ্ছা থাকায় কেহ আর উত্তাপের অপব্যয় করিতে চাহিতেছে না। প্রায় সকলে গোঁজ হইয়া বসিয়া আছে কিংবা একদৃষ্টে কোন দিকে চাহিয়া ক্রোধটাকে পরিপুষ্ট করিতেছে।

কুলদাচরণ নিজের ঘরে বসিয়া প্রথম উৎসাহে তাহার 'বাবুর্চি' নামক বইটার মাংসের অধ্যায় প্রায় মুখস্থ করিয়া ফেলিল। তাহার পর শচীনাথের ব্যবহারে মনটা করুণ-রসসিক্ত হইয়া উঠায় বউয়ের নামে খানিকটা বিরহগাথা লিখিল। এখন আবার মনের অবস্থা বদলাইয়া যাওয়ায় 'মেঘনাদবধ কাব্য' পড়িতেছে। গণপতি ক্রমাগত বাহিরে যাইতেছে আর শচীনাথের ঘরে ফিরিয়া আসিয়া বলিতেছে, এ দমবাজির সাজা যদি না দেওয়া হয় তো বুঝব সব ভেড়ার দল, কাওয়ার্ড্‌স।

রান্নাঘরের অবস্থাটা খুব সংক্ষেপে বর্ণনা করা যায়—পটলভাজা নামিয়াছে, চাটনি নামিয়াছে; আর কিছু চড়েও নাই, নামেও নাই। এদিকে মাংস, গলদা-চিংড়ি আর ভুনিখিচুড়ির জন্য বাটা-মসলা তাল তাল পড়িয়া আছে। কোণে দই সন্দেশ ঢাকা।

মৃত্যুঞ্জয় এই তৃতীয় বার সকলের নিকট চাল আর ডালের জন্য পয়সা চাহিয়া হারিয়া বসিয়া আছে। দুই-একজন একটু উষ্মার সহিতই বলিয়াছে, জেনে শুনে আর ঠাট্টা করবেন না মশায়; আজ মেজাজ ঠিক নেই।

গণপতি কি এক রকম মুখ করিয়া শচীনাথের বরবেশে তোলা যুগল ফোটোর দিকে চাহিয়া ছিল, টেবিলে ঘুষিটা টিপিয়া ধরিয়া বলিল, উঃ, পাই একবার এই সময়!

এমন সময় রাস্তার দুয়ারে দুইটা লঘু আঘাত পড়িল এবং জড়িত-কণ্ঠে আওয়াজ শোনা গেল, ঠাকু—র!

ওই এসেছে! বলিয়া সমস্ত মেস কাঁপাইয়া একটা হিংস্র রব উঠিল এবং গণপতি দুয়ারের দিকে ছুটিল, আমি দরজা খুলে দোব।

দুই-তিনজনে তাহাকে ধরিয়া ফেলিল। দুই-একজন ক্ষমাশীল মেম্বর বলিল, যাক, জিনিস তো এসে পড়েছে, ফৌজদারি ক'রে আর কি হবে?

সকলে হুড়াহুড়ি করিয়া নামিয়া আসিল। ওদিক হইতে শচীনাথও আসিয়া উঠানে দাঁড়াইয়াছে। প্রথম ঝোঁকে যাহার যাহা মনে আসিল, শ্লীলতা অশ্লীলতা বিচার না করিয়া একচোট বলিয়া লইল। কুলদা 'বাবুর্চি' বইটার ভিতরে একটা আঙুল দিয়া নামিয়া আসিল, বলিল, উঃ, মস্ত একটা জিনিস বাদ প'ড়ে গেছে। এতে বলছে, কোর্ম্মা রাঁধতে হ'লে—কই, কুলী বেটা কোথায়? চম্পট দিলে না তো? সেটাকে চোখের আড়াল—

শচীনাথ এতক্ষণে কথা কহিল, বলিল, কুলী নেই, জিনিস কিছুই আসে নি।

অ্যাঁ, জিনিস আসে নি! মটন! গলদা!—ইত্যাকারে আবার একটি নারকীয় কলরব উঠিতেছিল। শচীনাথ আপনার কাটা পকেটের

মধ্য দিয়া সমস্ত হাতটি চালাইয়া দিল ও অঙ্গুলি পাঁচটা ছড়াইয়া হাতটা সকলের সম্মুখে তুলিয়া ধরিল, বলিল, একটি আধলা ছেড়ে যায় নি।

কলরবটা একেবারে ঠাণ্ডা হইয়া গেল এবং প্রথম বিস্ময়ের মূঢ়তায় সকলে পরস্পরের মুখ-চাওয়াচাওয়ি করিতে লাগিল।

এ পর্য্যন্ত শচীনাথের প্ল্যানটা বেশ খাটিয়া গেল এবং সে মনে মনে মোক্তার প্রপিতামহের স্মৃতির উদ্দেশ্যে পরম ভক্তিভরে একটা প্রণাম ঠুকিয়া দিল।

ওদিকে কিন্তু আদ্দির ফিনফিনে পাঞ্জাবির অন্য পকেটের দুই কোণ দিয়া কাঁচির দাঁড়া দুইটা বাহির হইয়া ঝকঝক করিতেছিল। মোক্তার প্রপিতামহের বুদ্ধির সহিত কেরানী শচীনাথের নিজের বুদ্ধিও খানিকটা মিশিয়া গিয়াছিল। তাড়াতাড়িতে কাঁচিটা পকেটে রাখিয়া দিয়াছিল, সেটা যে ফেলিয়া দেওয়া দরকার, সমস্ত রাস্তায় সে হুঁশটাই একেবারে হয় নাই। প্রথমে নজরে পড়িল ঠাকুরের। সে পকেট হইতে কাঁচিটা সযত্নে টানিয়া বাহির করিল এবং নিজের বিচার অনুযায়ী রহস্যটার মীমাংসা করিয়া বিস্ফারিত নেত্রে কহিল, এঃ, ফিন ই পকেটভি কাটতে গিয়েছিল, তাড়াতাড়াতি কাঁচিটা ফেলিয়ে গিয়েছে।

শচীনাথ শুষ্ক কণ্ঠে বলিল, তাই তো দেখছি।—বলিয়া ভূতগ্রস্তের মত আস্তে আস্তে উপরে উঠিয়া গেল।

সকলে আবার একবার অন্যভাবে পরস্পরের মুখ-চাওয়াচাওয়ি করিতে লাগিল। গণপতি যেন হঠাৎ ঘুমের ঘোর হইতে জাগিয়া বলিয়া উঠিল, কাঁচি—কাঁচিই সই—দাও তো ঠাকুর, দেখি একবার—

কয়েকজন সতর্ক ছিলই, তাহাকে ধরিয়া ফেলিল।

সেই ঠাণ্ডা বর্ষারাত্রে দই-সন্দেশের সহিত পটলভাজা আর আলু বোখারার চাটনির নূতনবিধ্ব এবং অতি-সংক্ষিপ্ত ফীস্টের সময় নানান রকম গাঁটকাটার গল্প চলিল; তাহার মধ্যে নিজের গাঁট নিজেই কাটার দুই-একটা রহস্যময় এবং রোমাঞ্চকর গল্পও শোনা যাইতে লাগিল।

এক রাত্রি

১

ঘটনাটির সূত্রপাত হয় মোকামাঘাটে।

ভিড় ছিল, তবে এমন নয় যে, উঠিতেই পারিতাম না। একলা লোক, তায় লটবহর নাই। স্থান হইল না অন্য কারণে; আসলে মনটা কাব্যরসে সিক্ত হইয়া অত্যন্ত উদার হইয়া পড়িয়াছিল; কেমন যেন মনে হইতেছিল, এ পর্য্যন্ত পৃথিবীর যথেষ্ট উপকার করা হয় নাই। তাই নিজে সরিয়া দাঁড়াইয়া আর সকলকেই উঠিবার সুবিধা করিয়া দিতেছিলাম।

এমন সময় গাড়িটা ছাড়িয়া দিল। যে বাবুটিকে সকলের শেষে সপরিবারে উঠিতে সাহায্য করি, তিনি চলতি গাড়ির দুয়ার আগলাইয়া বলিলেন, খবরদার মশায়, ঠেলে দিতেও পেছপা হব না। হ্যাঁ, দেখছেন গাড়ির অবস্থা? এতক্ষণ হাঁদার মত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে করছিলেন কি?

এক্সপ্রেসটা মিস করিলাম, বলিলাম, যাকগে, প্যাসেঞ্জারে দিব্যি শুয়ে শুয়ে যাওয়া যাবে। ষ্টীমারের জেটির উপর গিয়া আসন্ন সন্ধ্যার স্তিমিত আলোকে বইটা খুলিয়া আবার পড়িতে লাগিয়া গেলাম। রবিবাবুর 'গল্পগুচ্ছ'। 'এক রাত্রি' গল্পটা চলিতেছিল, যেখানটায় নূতন স্কুল-মাস্টারি লইয়া আবার সুরবালার বড় কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছি, সেইখানটা। নিজেকেই নায়কের পদে বসাইয়া দিলাম বলিয়া কেহ যেন কিছু মনে না করেন। অবস্থাটা তখন প্রায় এমনই হইয়া পড়িয়াছে।

গাড়ি আসিলে বইয়ের পাতায় আঙুল গুঁজিয়া দিয়া অলস গতিতে গিয়া এক ইণ্টার ক্লাসে উঠিলাম। গুছাইয়া বসিয়া এইবার বইটি খুলিব, এমন সময় সামনের দিকে নজর পড়ায় একটু সচকিত হইয়া উঠিলাম। গাড়ির ওই পাশটায় কোণে জড়সড় হইয়া একটি রমণী বসিয়া। ভাবে এবং বিদ্যুতের আলোয় সযত্ন-আচ্ছাদিত হস্তপদাদির যেটুকু দেখা গেল, তাহা হইতেও বোঝা গেল, রমণী যুবতী। পোশাকপরিচ্ছদ সম্বন্ধে কোন ধারণা পাওয়া গেল না, তবে সমস্ত অঙ্গটি বেড়িয়া আলগাভাবে যে একখানা রেশমী চাদর জড়ানো ছিল, তাহা হইতে বেশ বোঝা গেল, সে কোন অবস্থাপন্ন ঘরেরই মহিলা; ইণ্টার ক্লাসে বসার ব্যাপারটাও এ অনুমানটুকুর পরিপোষণ করিল।

ভাবিলাম, মরুক গিয়া, আমার এ কৌতূহলের অধিকার কি? মনের লাগাম কষিয়া পুস্তকের অক্ষর-পথে চালিত করিবার চেষ্টা করিলাম। কিন্তু ক্রমেই বিষয়টার অপূর্ব্বত্ব আমাকে যেন নাছোড়বান্দা হইয়া পাইয়া বসিল। তখন অধিকার লইয়া তর্কটুকুই অন্য আকারে আসিয়া দেখা দিল; মনে হইল, এক্ষেত্রে এমন উদাসীনভাবে বসিয়া থাকিবারই কি আমার কোন অধিকার আছে? এই বেটাছেলেদের গাড়িতে আমি আর একটিমাত্র স্ত্রীলোক—সে অপরিচিতা। এই তো গাড়ি আসার সঙ্গে সঙ্গেই আমি উঠিয়া বসিয়াছি, কই, কেহ তো নামিয়া যায় নাই! তবে এ অভিভাবকহীনা কে? যদিই বা অভিভাবক ছিল, দৈবযোগে সঙ্গচ্যুত হইয়া পড়িয়াছে, তাহা হইলে একবার প্রশ্ন করিয়া বিষয়টা জানা উচিত নয় কি আমার?

ইহাতেও একটু সন্দেহ হইল। এই কি বিপদে পড়ার ভাব? বিশেষ করিয়া স্ত্রীলোকের পক্ষে? যাহা হউক, ভাবিলাম, গাড়িটা ছাড়িয়া যাক না, শেষ পর্য্যন্ত যদি কেহ না আসিয়া পৌছায় তো ব্যাপারটা

তখন এক দিকে স্পষ্ট হইয়া উঠিতে পারে। প্যাসেঞ্জার ট্রেন, পরের স্টেশনেই তো থামিতেছে, এত তাড়াতাড়ি কিসের ?

গাড়ি ছাড়িল, কেহ আসিল না। আমার রহস্যময়ী সঙ্গিনী একটু নড়িয়া-চড়িয়া বস্ত্রাবরণে একটা হিল্লোল তুলিয়া আবার সেইরূপ জড়বৎ নিশ্চল হইয়া বসিয়া রহিলেন। গাড়িটা শুধু গতিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই মৃদু দোল দিতে আরম্ভ করিয়া দিল।

ব্যবধানটা একটু বেশি ছিল বলিয়া গাড়ির আওয়াজটা বাড়িবার পূর্ব্বেই প্রশ্ন করিলাম, আপনি কি একা—

শেষ করিতে পারিলাম না, কারণ ছাঁৎ করিয়া মনে হইল, একা কথাটা ব্যবহার করা বড় ভুল এবং নিতান্ত অসঙ্গত হইয়া গিয়াছে, বিশেষ করিয়া জিজ্ঞাসার আকারে।

আমি মনের ভাবটা গুছাইয়া বলিবার জন্য ভাষা খুঁজিতে লাগিলাম, তরুণী উত্তরস্বরূপ বামহাতখানি বাহির করিয়া ঘোমটাটা একটু টানিয়া দিলেন। একখানি পেলব নধর ভুজলতা—তুলিতেই একগাছি রুলি আর গুটিকয়েক রেশমী চুড়ি ঠুনঠুন শব্দে মণিবন্ধ ছাড়িয়া হাতের মাঝখানে নামিয়া আসিল। মনে হইল, যেন আমার ভাবগতিক দেখিয়া তাহারা একে অন্যের গায়ে হাসিয়া লুটাইয়া পড়িল।

ব্যাপারটুকু সামান্যই এবং সত্যই কিছু আমাকে বিদ্রূপ করিবার জন্য চুড়ি-মহলে মাথাব্যথা পড়িয়া যায় নাই। কিন্তু আমার একটু চমক ভাঙিল। হাসিয়া মনে মনে বলিলাম, মিছে নয়, জড়ের মুখে হাসি ফুটাইবার মতই অবস্থা দাঁড়াইয়াছে বটে। তখন পৌরুষকে জাগ্রত করিয়া বেশ স্পষ্ট সবল কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি একলা এ অবস্থায় রয়েছেন, কোন বিপদ-আপদ ঘটেনি তো ? কোন রকম সাহায্য করতে পারি কি ? সব কথা খুলে বলুন, কোন দ্বিধা করবেন

না।—এই অকুণ্ঠিত কথাগুলিতে মনে মনে বেশ একটা আত্মপ্রসাদ অনুভব করিলাম, যেন এক মূহূর্ত্তে বিশ্বের নারীর দায়িত্ব লইয়া আমি পুরুষ, সর্ব্ববিধ অলস লঘুত্বের উপর আত্মপ্রতিষ্ঠা করিয়া ফেলিলাম। বোঝা শক্ত হইয়া উঠিল যে, আমরা এই স্বল্পপ্রাণা জাতিটার কাছে হঠাৎ থাকিয়া থাকিয়া এমন দুর্ব্বল হইয়া পড়ি কোথা হইতে, যাহাতে এমন গোটাকতক সোজা কথা বলিতেও জিহ্বা জড়াইয়া আসে?

আমার স্বল্পপ্রাণা সঙ্গিনী কিন্তু কোন উত্তর দিলেন না, তাহার পরিবর্ত্তে যাহা করিলেন, তাহাতে জটিল সমস্যাটি আরও নিবিড়ভাবে জটিল হইয়া উঠিল মাত্র। অবগুণ্ঠনের অন্তরালে চাপা ক্রন্দনের আভাস পাওয়া যাইতে লাগিল। ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কান্না, মাঝে মাঝে সমস্ত শরীরটা কাঁপিয়া উঠিতেছে। যুবতী কখন বা বস্ত্রাঞ্চলে, কখন বা ঘোমটার অল্পপরিসর কাপড়টুকু দিয়াই অশ্রুমোচন করিতেছে। মনটা বড়ই ব্যথিত হইয়া উঠিল, কিন্তু কি উপায় আমার? আমার ক্ষুব্ধ পৌরুষ লইয়া ওর নীরবতার গণ্ডির বাহিরে বিফল উদ্বেগে বসিয়া থাকা ভিন্ন আর উপায় ছিল না। বসিয়া বসিয়া নানান রকম সম্ভব অসম্ভব কল্পনা করিতে লাগিলাম, কিন্তু কোনটাকেই একটা সন্তোষজনক মীমাংসায় লইয়া যাইতে পারা গেল না।

এই অবস্থাতেই কয়েকটা স্টেশন পার হইয়া গেল। গাড়ির এক কোণে পৃথিবীর চিররহস্যময়ী নারী রহস্যের এ একটা নূতনতর আবরণে, আর অন্য কোণে চিরমূঢ় পুরুষের প্রতিভূ আমি এই এক নূতনবিধ ফাঁপরে পড়িয়া। গতিকটা মোটেই বলিবার বুঝাইবার যোগ্য নহে।

অবশেষে ঘটনাটা ক্রমশ একঘেয়ে এবং অল্পবিস্তর ভয়াবহ হইয়া পড়ার দরুন তাহা হইতে কাব্যের অংশটুকু উবিয়া যাওয়ার জন্যই হোক আর যাই হোক, মাথায় একটু বুদ্ধি আসিয়া জুটিল। একটা

স্টেশনে গাড়ি আসিয়া থামিলে বলিলাম, আপনি না হয় স্ত্রীলোকের কামরায় চলুন না, সঙ্গে ক'রে দিয়ে আসছি। সেখানে সব কথা খুলে বলতে পারবেন।

আশ্চর্য্যের বিষয়, রমণী ইহাতে তীব্র আপত্তির সহিত সঘনে হাত নাড়িয়া উঠিল; অনামিকাতে একটি নীলার আংটি যেন কয়েকটি মিনতির অশ্রুকণা বর্ষাইয়া ঝিকঝিক করিয়া উঠিল।

তখনও বুদ্ধিটার কিছু অবশিষ্ট ছিল বলিতে হইবে। বলিলাম, বেশ, না হয় কোন স্ত্রীলোককে ডেকেই আনছি, মেয়েগাড়িতে অনেক বয়স্থা স্ত্রীলোকও তো থাকেন।

এবার ত্রস্ত শঙ্কিত ভাবে রমণীর মাথা পর্য্যন্ত নড়িয়া উঠিল, এবং অস্ফুটস্বরে দুই-তিনবার শোনা গেল, না—না—না।

তখন আমি কড়া হইয়া বলিলাম, তা হ'লে আমাকেই বলতে হবে, ব্যাপারটা কি। কেন কাঁদছিলেন বলুন তো?

আবার সেইরূপ জড়বৎ নিশ্চল নীরব। প্রশ্ন করিলাম, বাড়ি কোথায় আপনার?

উত্তর না পাইয়া আবার জিজ্ঞাসা করিলাম, স্বামীর নাম?

মাথাটি না-এর ভঙ্গীতে নড়িয়া উঠিল। জিজ্ঞাসা করিলাম, বিবাহ হয় নি?

মাথা নাড়িয়া জানাইল, না।

একটু থামিয়া কথাটা যথাসম্ভব গুছাইয়া বলিলাম, কোন দুর্বৃত্তের হাতে পড়েছেন কি?

আর কোন উত্তর পাওয়া গেল না, অস্ফুট স্বরের মধ্য দিয়াও নয়, কিম্বা ঘোমটা-ঢাকা মাথার মৃদু সঞ্চালনেও নয়। এত কাছাকাছি, অথচ সমস্ত রাত্রের ভিতর কথার মধ্যে পাওয়া গেল ওই তিনটি ত্রস্ত

চাপা—'না—না—না' ; আর পরিচয়—ওই দুইটি ইঙ্গিত হইতে যাহা চুনিয়া লওয়া যায়। ইহাতে অন্তরের উদ্বেগ তো শীতল হইলই না বরং কল্পনার উত্তাপ সৃষ্টি করিয়া মনটাকে ক্রমে একটা ব্যথা-আশঙ্কার বাষ্পে ভরিয়া দিল।

গাড়ি নক্ষত্রবেগে ছুটিয়াছে। মুখ বাহির করিয়া নৈশ প্রকৃতির দিকে চাহিলাম। স্তব্ধ অপরিস্ফুট জ্যোৎস্না প্রাণময় জগৎকে আপনার মোহ-আলিঙ্গনে বদ্ধ করিয়া যেন ঘুমাইয়া আছে। বিরলনক্ষত্র আকাশ। চাঁদের উপর একখণ্ড মন্থরগতি মেঘের আবরণ পড়িয়াছে। একটিমাত্র তারা চোখে পড়ে, সে যেন তাহার সমস্ত দীপ্তি দিয়া ওই মেঘাবগুণ্ঠনের ওপারে তাহার কৌতুকদৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে চায়।

বলিতে কি, বেশ বুঝিতে পারিলাম, আমি পরাভূত হইয়া আসিতেছি। একেই পড়িতেছিলাম "এক রাত্রি", তাহার উপর এক-রাত্রিব্যাপী একখানি খণ্ডকাব্যের এই অতি-বাস্তব আয়োজন ; এ ক্ষেত্রে পরাভব হওয়া ছাড়া আর উপায়ান্তর ছিল না। মনে হইল, কিই বা ক্ষতি এমন? জীবনের এই নিরুদ্দেশ যাত্রাপথে শুধু একটি রজনীর জন্য আমরা অপরিচিত দুইটিতে যদি এত কাছাকাছি আসিয়াই পড়িয়া থাকি তো এমন বিরসভাবে পাশ কাটাইয়া যাইবারই বা সার্থকতা কোথায়? কি জানি, আমার এ সাহচর্য্য ওর মনে কি ভাব তুলিয়াছে ; কোন ভাবই তুলিয়াছে কি না, তাহারই বা স্থিরতা কি? কিন্তু তাহা ভাবিয়া আজিকার রাত্রে তীব্র গতির এই মাদকতা ও নিথর জ্যোৎস্নার মধুর অবসাদের মধ্যে উহাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া যদি খানিকটা ভাবের পুঁজি সংগ্রহ করিয়া লইতে পারি তো কাহার তাহাতে আসিয়া যায়? ওর দুইটি বাণী, কি এতটুকু দৃষ্টি যদি আমার সে কল্পনাকে পুষ্ট করেই তো সেটা কি এতই আশঙ্কার বিষয় হইয়া পড়িবে?

বিধাতার দয়াই হউক আর চক্রান্তই হউক—সব দিক দিয়াই যেন কাব্যটুকু জমিয়া উঠিতে লাগিল।

লক্ষীসরাই স্টেশনে একজন শুভ্রশ্মশ্রু প্রাচীনপন্থী মুসলমান উঠিলেন। আদবকায়দামত অভিবাদনাদি শেষ হইলে ও কোণে নজর পড়িতে অতিমাত্র সঙ্কুচিত হইয়া পড়িলেন, বলিলেন, এঃ, আপনার বিবিসাহেবা এ গাড়িতে রয়েছেন, না দেখে প্রবেশ ক'রে বড়ই বেয়াদবি ক'রে ফেলেছি, মাফ করবেন। আপনি বারণ ক'রে দিলেই পারতেন। আমি নেমে অন্য গাড়িতে যাই। বেয়াদবিটা মাফ করতে হবে। কুলী!

আমি এক অদ্ভুত উত্তর দিয়া বসিলাম, না না, সে কি? যখন উঠে পড়েছেন, থাকুন। আপনি আমাদের পিতার বয়সী।

বিবিসাহেবার প্রতিবাদ তো করা হইলই না, অধিকন্তু মুখ হইতে বেশ সরলভাবে বাহির হইয়া গেল—আপনি আমাদের পিতার বয়সী।

একবার সেই জড়মূর্ত্তির উপর আপনিই দৃষ্টিটা গিয়া পড়িল। না, অনুমোদনের সুস্পষ্ট আভাস না থাকিলেও, আপত্তিকরও তো কোন ইঙ্গিত নাই!

রহস্য অতল।

২

কিউলে গাড়ি থামিলে হঠাৎ একটু বড়মানুষি করিয়া কেল্‌নারের হোটেল হইতে খানা সারিয়া আসিবার ইচ্ছাটা বলবতী হইয়া উঠিল। কেন, তাহা ঠিক বলিতে পারি না। তবে নিজেকে যেন আজ রাত্রে ইতরসাধারণের অপেক্ষা বিশিষ্ট বলিয়া মনে হইতে লাগিল। নীচেকার রাস্তা দিয়া ও প্ল্যাটফর্মে গিয়া উঠিলাম, সদর্পে হোটেলের সম্মুখ

পর্য্যন্তও গেলাম, তাহার পর ভিতরে ভোজনরত লাল মুখের ভিড় দেখিয়া আস্তে আস্তে শিস দিতে দিতে ফিরিয়া আসিলাম। প্ল্যাট-ফর্মের ভেণ্ডারের নিকট এক পেয়ালা চা পান করিয়া কেল্‌নারের শখ মিটানো গেল। তাহার পর ইতর সাধারণের মত কিঞ্চিৎ পুরী ও মিষ্টান্ন সংগ্রহ করিয়া গাড়িতে আসিয়া উঠিলাম। সব মিলিয়া একটু বিলম্ব হইয়া গিয়াছিল।

আসিয়া দেখি, ব্যাপার গুরুতর। আমার সঙ্গিনী গাড়ির কোণে বস্ত্রের একটি পুঁটুলিবিশেষ হইয়া ক্রন্দনরতা। সামনে দুইজন পুরুষ এবং একটি স্ত্রীলোক টিকিট-কালেক্টর। মেম বলিতেছে, জলদি বোলো, নেহি তো উতার দেঙ্গি, আভি গাড়ি খুলতি হ্যায়; টিকিট আপনে পাস কেঁউ নহি রখি?

একজন টিকিট-কালেক্টর ফিরিঙ্গী। হাত ঘুরাইয়া রিস্টওয়াচটা দেখিয়া ইংরেজীতে বলিল, আচ্ছা ফেসাদে পড়া গেল তো, সময় যে হয়ে এল!

অপরটি হিন্দুস্থানী, বলিল, আপনি কি বাঙ্গালীন আছে? কোন্ ভাষায় কোথা বলতে পারেন? আমাদের তিনজোনারহি বোলি সোমঝাতে পারছেন না?

আমাকে উহারা কেহ দেখিতে পায় নাই, এদিকে পিছন ফিরিয়া ছিল। বুঝিলাম, সঙ্গিনী টিকিটহীনাও। যাহা হউক, ভাবিবার সময় ছিল না, যেন এইমাত্র ঢুকিয়াছি এই ভাবে বলিলাম, এ কি! কি ব্যাপার মেমসাহেব?

আমার দিকে চাহিয়া একসঙ্গে ফিরিঙ্গী ইংরেজীতে, মেমসাহেব হিন্দীতে ব্যাপারটা বুঝাইতে শুরু করিয়া দিল। হিন্দুস্থানীটি তাড়াতাড়ি বারণস্বরূপ হাত দুইখানা তাহাদের মুখের কাছে ধরিয়া বলিল, সব

বাঙ্গালী মাশা, হিন্দী ইংলিশ নেহি জানতা। I am understanding him in Bengali। এই আওরাৎ লোকটির সাথমে—

আমি তাহার বাংলার স্রোতে বাধা দিয়া শুদ্ধ হিন্দীতে বলিলাম, বুঝেছি ; তা মেয়েছেলেদের টিকিট প্রায়ই তাঁদের অভিভাবকদের কাছে থাকে, এটা বুঝে আপনারা একটু অপেক্ষা করতে পারতেন। এই নিন, তবে ব্যাপার এই যে, আর একখানা অর্থাৎ এক হিসেবে আমার টিকিটখানা আপনাদের দেখাতে পারলাম না। দু-তিন জায়গায় দাম চোকাবার জন্যে ব্যাগ খুলতে একখানা কোথায় প'ড়ে গেছে, সেই খোঁজেই এতটা দেরিও হয়ে গেল। মোতিহারি থেকে বর্দ্ধমান, এই টিকিট দেখলেই বুঝতে পারবেন। কত দিতে হবে?

আমার নূতন ওয়ার্ডের দিকে একবার চাহিলাম। ঘোমটা-টানা মুখটা এদিকে ফিরানো রহিয়াছে। ঘোমটার পাশের কাপড়টা ঘুরাইয়া মুখের নিম্নভাগটা চাপিয়া আছেন। ঠিক চক্ষু দুইটির পরিমাণে সামান্য একটু অবকাশ। চক্ষু দেখা যায় না, বোধ হয়, কালো চোখের দীর্ঘ পল্লবে ঘোমটার ছায়াটা আরও নিবিড় করিয়া দিয়া থাকিবে। কিন্তু নাই দেখি, বেশ অনুভব করিতেছিলাম, দুইটি ডাগর চোখের স্নিগ্ধ দৃষ্টি আমার সমস্ত শরীরে প্রসন্নতা বর্ষণ করিতেছে। সারা দেহ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। ভাবিলাম, কৃপণের মত এই অতি-সংযত দান, কিন্তু এটুকুরই জন্য কিই না দেওয়া যায়, কিই না করা যায়, এই প্রসাদকণিকার জন্য নিজের সমস্ত দেওয়া-করাকে কতই না তুচ্ছ বলিয়া মনে হয়!

আমি শুদ্ধ হিন্দী বলিতে পারি, বোধ হয়, সেই অপরাধে হিন্দুস্থানী টিকিট-কালেক্টরটি জরিমানার জন্য জিদ করিলেও, ফিরিঙ্গী মোতিহারি হইতে বর্দ্ধমান পর্য্যন্ত নিছক ভাড়া লইয়াই ছাড়িয়া দিল। দলটা

নামিয়া গেলে একটু নিকটে গিয়া বলিলাম, এই রাখুন টিকিটটা। আগে বলেন নি কেন? টিকিটের জন্যে কত বিড়ম্বিত হলেন দেখুন তো।—একটু অভিমানের স্বরেই কথাগুলা বাহির হইল। আঘাতটা আমারই বেশি লাগিয়াছিল কিনা।

ডান হাতের শুধু আঙুল কয়টি কাপড়ের রাশির মধ্য হইতে বাহির করিয়া প্রসারিত করিয়া ধরিলেন। রাঙা টিকিটখানি মাঝখানে আলগোছে রাখিয়া দিয়া কহিলাম, কই, আপনার তো কিছু খাবার কেনা দেখছি না?

এই সময় গার্ড হুইস্‌ল দিল। দুয়ারের কাছে তাড়াতাড়ি আসিয়া 'খাবারওয়ালা, খাবারওয়ালা' করিয়া চীৎকার করিলাম।

কেহ উত্তর দিল না। নিকটে একটা ছিল, ভ্রূ নাচাইয়া বলিল, বড়া চালাক হায়, হুইসিল দিয়া, আউর—খাবারওয়ালা, খাবারওয়ালা!

ডাকিলাম, পানিপাঁড়ে!

সঙ্গিনীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ঘটি আছে?

বেঞ্চের নীচের দিকে তর্জ্জনীর সঙ্কেত হইল—একটি সুদৃশ্য জার্মান-সিল্‌ভারের ঘটি। বাহির করিয়া পানিপাঁড়ের নিকট জল লইলাম। তাড়াতাড়িতে খঞ্চেতে একটা আট-আনি দিয়া চার দোনা অর্থাৎ এক আনার পান লইলাম। পয়সা ফেরত পাইলাম না, কারণ খঞ্চের মাঝখানে চোখের সামনে এক কাঁড়ি পয়সা থাকিলেও পানওয়ালার হঠাৎ বিশ্রী রকম দৃষ্টিবিভ্রম আসিয়া পড়িল। সেই অবসরে গাড়ির বেগ বাড়ায় আমরা প্ল্যাটফর্মের বাহিরে আসিয়া পড়িলাম।

সাত আনা পয়সা গেল, কিন্তু সাত আনা পয়সা অথবা পয়সা মাত্রই গ্রাহ্য করি, মনটা সে সময় এরূপ বস্তুতান্ত্রিক ছিল না। সঙ্গিনীকে উদ্দেশ করিয়া বলিলাম, এসব তো হ'ল, কিন্তু খাবার আপনার নেওয়া

হ'ল না তো! তা নাই হোক, আমার এগুলো দরকার হবে না। চা-টা খেয়েছি।—বলিয়া সমস্ত খাবার, জল, তিন দোনা পান সামনের বেঞ্চের উপর রাখিয়া দিলাম। একটু ক্ষুব্ধভাবে বলিলাম, অনেকক্ষণ খান নি নিশ্চয়। খাবার খুবই সামান্য হ'ল। এ পর্য্যন্ত মুখ ফুটে কিছু বললেন না তো—আমার আর দোষ কি বলুন?

এখানে সুন্দরী আমায় একটু কৃতার্থ করিলেন। খাবারের ঠোঙাটি লইয়া আমার দিকে পশ্চাৎ করিয়া বসিলেন। ঘটি হইতে জল লইয়া মুখ ধুইয়া আহারে প্রবৃত্ত হইলেন এবং দুই-চারি মিনিটের মধ্যেই ঠোঙাটি খালি করিয়া জানালা গলাইয়া বাহিরে ফেলিয়া দিয়া ঘটির প্রায় অর্দ্ধেক জল ঢকঢক করিয়া পান করিয়া ফেলিলেন।

বলিতে কি, আমি ঠিক এ রকমটি আশা করি নাই। আশা যাহা করিয়াছিলাম, তাহা বরং এই যে, আহার্য্যের কিছু অংশ দরদভরে আমি শ্রীহস্ত হইতে লাভ করিব।

আমার কাব্যের অতি-কোমল অঙ্গে একটি রূঢ় আঘাত লাগিল। কিন্তু সুখের বিষয় হউক আর নাই হউক, ব্যথাটা স্থায়ী হইল না। সঙ্গিনীর গ্রহণ এবং ভোজনের মধ্যে যে একটা নগ্ন স্থূলতা ছিল, একটু চেষ্টা করিয়া ভাবিতেই সেইটাই আমার চক্ষে সুন্দর হইয়া ফুটিয়া উঠিল। মনকে বুঝাইলাম—প্রত্যেক মানুষটির মধ্যে একটি পশু বর্ত্তমান। আমরা তাহাকে চাপড়াইয়া-চুপড়াইয়া শিষ্ট এবং সংযত করিয়া রাখি, এবং লোকচক্ষুতে এই শিষ্টতাটি হয় সৌন্দর্য্য। এ এক ধরনের সৌন্দর্য্য বটে। কিন্তু ইহার মধ্যে সৌন্দর্য্যের পূর্ণ রূপটি তো পাওয়া যায় না। সে রূপ পাওয়া যায়, যখন প্রকৃতির তাড়নায় সেই পশুটি সংযমের এবং আচারের সমস্ত শৃঙ্খল ঝনঝনাইয়া তাহার সমগ্র বীভৎসতায় বাহির হইয়া আসে। তখন মানুষের কোমলতা ও পশুর

কঠোরতা মিলিয়া এক অপরূপ রসের সৃষ্টি হয়, সেই পূর্ণ। ঝরনার শ্রী যেমন শুধু স্নিগ্ধ স্বচ্ছ কালো জল হইলেই হয় না, তাহার সঙ্গে গর্জ্জন চাই, আর চাই উপলবিক্ষুব্ধ ফেনার আবিলতা।

এই রহস্যময়ী কোমলাঙ্গীর ক্ষুধা-উগ্র আহারের মধ্যে আমি এই রকম গোছের একটা মাধুর্য্য দেখিয়া নিজেকে কৃতার্থ মনে করিলাম।

দেখিলাম, সুন্দরী পানের দোনা হইতে পান বাহির করিয়া হাতে ধরিয়া নিশ্চলভাবে বসিয়া আছেন। প্রশ্ন করিলাম, জরদা খান ?

ঘোমটাটি সম্মতির ভঙ্গীতে দুলিল। মৌন হইলেও এ উত্তরটুকু শব্দের এত কাছাকাছি যে, আমি প্রায় আত্মবিস্মৃত হইয়া গেলাম। পকেটে বন্ধুর দেওয়া বিদায়ের স্মৃতিচিহ্ন খাঁটি রূপার একটা জরদার কৌটা ছিল—মিনার কাজ করা এবং মাঝখানে সোনার একটি পান বসানো। একটু জরদা নিজের জন্য ঢালিয়া রাখিয়া কৌটাটা দিবার জন্য উঠিয়া গেলাম ; বলিলাম, রাখুন আপনার কাছে, পান খাওয়া হয়ে গেলে দিলেই হবে।

আবার একবার পাঁচটি সোনার আঙুল প্রসারিত হইল। সামান্য একটা রাঙা রেলটিকিট পড়িয়া যেখানে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিয়াছিল, সেখানে কারুমণ্ডিত শৌখিন সেই সোনা-রূপার পাত্রটি যে কি মোহ রচনা করিল, কি করিয়া জানাই ! দেখিলাম একটু। কিন্তু আশ মিটিবার পূর্ব্বেই আঙুল কয়টি চাদরের মধ্যে অন্তর্হিত হইল। আর কতক্ষণে, কতদিনেই বা মানুষের এ আশ মিটে ? কবেই বা মিটিয়াছে ?

একটি দীর্ঘনিশ্বাস আপনি বাহির হইয়া আসিল।

নিজের সীটে আসিয়া বসিলাম এবং বেদনাটাকে চাপা দিবার জন্য বইটা খুলিয়া বসিলাম। গল্প শেষ হইয়া আসিয়াছে, পড়িয়া চলিয়াছি,

"...আর সমস্ত জলমগ্ন হইয়া গেছে। কেবল হাত পাঁচ-ছয় দ্বীপের উপর আমরা দুইটি প্রাণী আসিয়া দাঁড়াইলাম।...আজ সমস্ত বিশ্বসংসার ছাড়িয়া সুরবালা আমার কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। আজ আমি ছাড়া সুরবালার আর কেহ নাই।...আমি এই এক রাত্রে মহাপ্রলয়ের তীরে দাঁড়াইয়া অনন্ত আনন্দের আস্বাদ পাইয়াছি।...আমার পরমায়ুর সমস্ত দিনরাত্রির মধ্যে এই একটি মাত্র রাত্রিই আমার তুচ্ছ জীবনের একমাত্র চরম সার্থকতা।..."

বই মুড়িলাম। ভাবিতে লাগিলাম, সেই মহাসঙ্কট, পৃথিবীর আর সমস্ত সত্য মিথ্যা বন্ধন মুছাইয়া দিয়া, কবেকার একটা তুচ্ছ সম্বন্ধকে মৃত্যুর চিরান্ধকারের সম্মুখে মুহূর্ত্তের জন্য এমন উজ্জ্বলভাবে সত্যের আলোকে ফুটাইয়া তুলিল কেন? কোন্ রহস্যময়ের ইঙ্গিতে সুরবালা আজ সমস্ত জীবনের সম্বলরূপ একটি রাত্রির নিবিড় সান্নিধ্যের উপহার্ দিবার জন্য সেই ব্যর্থজীবন স্কুলশিক্ষকের পাশে আসিয়া দাঁড়াইল? সেই অদৃশ্য শক্তির নির্দ্দেশেই কি আজিকার রাত্রে এই মায়ারূপিণী আমার পথে আসিয়া পড়িয়াছে? কয়েক দণ্ড মাত্র লইয়া এই যে নীরব মিলন, ইহার মধ্যে কত যুগ, কত জন্মজন্মান্তরব্যাপী সাধনার সিদ্ধি কি পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিয়াছে? কে জানে!

আমার 'সুরবালা' তখন একেবারে মাথা উল্টাইয়া চার আঙুলে মোটা রকম জরদা লইয়া একটু গণ্যময় ভঙ্গিমায় মুখবিবরে চালান দিতেছিলেন। কিন্তু তাহাতে আমার কাব্যের রসটুকুকে একটুও বিস্বাদ করিতে পারিল না। অত কথা কি, ক্ষুধায় যে নাড়ীতে জট পাকাইয়া যাইতেছিল, সেই দিকেও বড় একটা ভ্রূক্ষেপ ছিল না।

জামুই স্টেশনে নামিয়া একটু দূরে গিয়া তাড়াতাড়ি এক ঠোঙা ছোলার অখাদ্য ঘুঘনি চিবাইয়া লইলাম, তাহার পর গাড়ি ছাড়িলে

সঙ্গিনীর নিকট জলের ঘটিটি ভিক্ষা করিয়া লইয়া তাঁহার পানের পর যেটুকু অবশিষ্ট ছিল, সমস্ত দেহ-মন দিয়া সেটুকু পান করিয়া লইলাম। তিনি আলগোছে পান করিলেও জলটুকু এক হিসাবে উচ্ছিষ্টই ছিল—মানি, এবং হয়তো সেইজন্যই তখন বোধ হইল, যেন দুইটি প্রাণীর মধ্যে একটা সুস্পষ্ট যোগ স্থাপিত হইয়া গেল, যেন আমাদের মধ্যে কোথায় একটা পার্থক্যের রেখা ছিল, ওই এক ঘটি জলে. সেটা ধুইয়া মুছিয়া গেল।

নিজেকে একটু প্রশ্রয় দিবার ফল এই হইল যে, এই যোগটুকুকে আরও ঘনিষ্ঠ করিয়া লইবার জন্য মনটা উৎকট রকম চঞ্চল হইয়া উঠিল। জল পান করিয়াই যে ফিরিয়া আসা উচিত ছিল, সেটা মনেই পড়িল না। পড়িবে কোথা হইতে? তখন সমস্ত মন জুড়িয়া এই একটা আকাঙ্ক্ষাই তোলপাড় করিতেছিল—হে সুন্দরি, আর কিছু নয়, দুইটি কথা দাও, তা সে যেমনই হউক না, তাহাতে আমার এ কাব্য-রজনীর রঙিন স্বপ্ন এক নিমেষে চুরমার হইয়াই যাক বা সে স্বপ্নের মোহ আমায় আরও—আরও হতচেতন করিয়া দিক, কিছুই যায় আসে না। সমস্তর উপরে আমি ওই দুইটি বাণী পাওয়াকেই আমার জীবনের পরম সত্য করিয়া রাখিব।

হঠাৎ চেতনা হইল। তাহাকে চেতনা বলি, কি ক্ষুব্ধ অভিমান বলি, কি নিরাশার আত্মগ্লানি বলি? নিজের জায়গায় আসিয়া বসিলাম। মনে মনে বলিলাম, না, এই ঠিক করিয়াছ। আমার এক রাত্রির সমস্ত প্রগল্ভতা এই বজ্রশাসনেই তুমি খর্ব্ব করিয়া রাখ। হে সম্রাজ্ঞি, আমার কি অধিকার তোমার বাণীতে? আর তোমার ধ্যানেই বা আমি তৃপ্তি খুঁজি কিসের জোরে? তোমার এই বিধানই উপযুক্ত। এই কঠিন নীরবতার বাঁধ দিয়া আমার এই

তোমা-মুখী চিন্তাস্রোতকে সারা রজনী এমনই করিয়াই নিরুদ্ধ করিয়া রাখ।

নিজেকে ভাগ্যহীন তো মনে হইলই, সেই সঙ্গে এই অভিমানটা বুকের মধ্যে গুমরিয়া উঠিয়া নিজেকে প্রবল অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া তবে শান্ত হইলাম। নিজেকে লইয়া এই দারুণ দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়িয়া এমনই শ্রান্ত হইয়া পড়িলাম যে, স্থির করিলাম, পরের স্টেশনে নিজে হইতেই কোন সঙ্গী ডাকিয়া লইব; কিংবা এই কামরাটাই ত্যাগ করিয়া যাইব। এই গাড়ির মধ্যকার অসহ্য গুমট আর যেন বরদাস্ত হয় না।

হায় রে, মানুষের এত দম্ভের আত্মজ্ঞান আর এত আড়ম্বরের আত্মবিশ্বাস!

পরের স্টেশনে একটি বাঙালী যুবক বোধ হয় তাহার বৃদ্ধ পিতা-মাতা, স্ত্রী, একটি ছোট কন্যা ও দুই-কুলী মালপত্র লইয়া খানিক দূর ছুটাছুটি করিয়া, শেষে আমার গাড়ির সামনে আসিয়া হন্তদন্ত হইয়া বলিল, মশায়, আর বোধ হয় এক মিনিটও সময় নেই, থার্ড ক্লাসে তো উঠতে পারলাম না, একটু দয়া ক'রে যদি—। নাও বাবা, তুমি আগে ওঠ—

আমি একটু ভাবিলাম, কি যে মাথামুণ্ড ভাবিলাম জানি না। পকেট হইতে রেলের চাবিটা বাহির করিয়া আস্তে আস্তে কুলুপে ভরিয়া মোচড় দিতে দিতে নির্বিকারভাবে বলিলাম, আজ্ঞে না, এখানে ভিড় করলে চলবে না, এগিয়ে দেখুন।

ঈশ্বর আমায় অসহ্য অবস্থায় করুণা করিয়া সঙ্গী দিলেন অকার্পণ্যের সহিত, আর আমি এমনই করিয়া তাঁহার সেই মহাদান প্রত্যাখ্যান করিলাম। আজ ভাবি, কি ভূত যে মাথায় চাপিয়াছিল সেদিন!

সমস্ত রাত্রি এই রকমে কাটিল, কখনও আশার তীব্র উন্মাদনায় সমস্ত শরীর-মন জাগ্রত, এতটুকু তন্দ্রার লেশ নাই যে, কল্পনার মধ্যে অস্পষ্টতা আনিতে পারে; আবার কখনও বা হতাশার অবসাদে, যাহাতে জাগরণটাকেও যেন নিদ্রার মতই শিথিল বলিয়া বোধ হয়।

সঙ্গিনী খানিকটা দিব্য ঘুমাইয়া লইলেন। একটু হিংসা হইল। ভাবিলাম, দিব্য আছ তোমরা, যত মাথাব্যথা কি ভগবান আমাদেরই দিয়াছেন!

৩

এই আমার এক রাত্রির ইতিহাস। আমার অন্তরের বাসনা রাত্রির সামান্য ঘটনা-সমাবেশের গায়ে যেমন ভাবে রঙ ধরাইয়া আসিয়াছিল, যথাযথভাবে তাহা লিপিবদ্ধ করিবার প্রয়াস করিয়াছি।

শেষ পর্য্যন্ত একটা গভীর নিরাশার কাহিনী। এ শুনাইয়া কাহাকেও বিড়ম্বিত না করিলেই ভাল হইত, তবে আমরা সবাই মায়াসঙ্কুল সংসার-পথের যাত্রী, আর যাত্রাটা অনেক সময় আবার রেলপথে সারিতে হয়, যেখানে মায়ারাক্ষসী সহস্র রূপে সদাই ওত পাতিয়া আছে। সেইজন্য, যতটা পারিলাম, সেই রাত্রের আমার দুর্ব্বল মনের ভাবটা লিখিয়া গেলাম। তখন ভাবিয়াছিলাম, এ কাহিনী কি এমনই অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে? দিনের আলো একে কি একটা বিপুল সার্থকতার মধ্যে পূর্ণ করিয়া দিয়া যাইবে না?

আর এখন ভাবি—। যাক, সে কথা তুলিতে আর প্রবৃত্তি নাই। সামান্য ভুলে সেদিন কি দুর্লভ সম্পদকে হারাইলাম, কি তীব্র একটা

অনুশোচনার দাগ যে সে আমার মনে মুদ্রিত করিয়া গিয়াছে, সে কথা ভাবিতে এখনও নিজের পৌরুষে ধিক্কার জন্মে।

তাই এই দুঃখের কাহিনীটা শেষ করিতেই চাহি।

খুব ভোর থাকিতে, তখনও অন্ধকারের পর্দ্দাটা একেবারে গুটাইয়া যায় নাই, ট্রেনটা আসিয়া পানাগড় স্টেশনে দাঁড়াইল। সঙ্গে সঙ্গে সেই মূর্ত্তিটি আপাদমস্তক বস্ত্রাবরণে ঢাকিয়া গাড়ির দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল এবং মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব করিয়া ধীরে ধীরে নামিয়া গেল।

ঘটনাটা লিখিতে সামান্য, কিন্তু তখন আমার কাছে সামান্য ছিল না। একবার মনে হইল, সারা রাত্রের সমস্ত অসার তর্কবিতর্ক ছিন্নভিন্ন লণ্ডভণ্ড করিয়া শেষবারের মত একবার ননীর হাত দুইখানি ধরিয়া নামাইয়া দিয়া এই জীবনের প্রথম এবং শেষ স্পর্শের একটা আভাস লই ; তাহা কিন্তু করা হইল না।

মূর্ত্তি নামিয়া দুই পদ অগ্রসর হইয়া, আমি যেখানটায় বসিয়া ছিলাম, প্ল্যাটফর্মে ঠিক তাহার নীচে আসিয়া দাঁড়াইল। বুঝিলাম, নতমুখী কৃতজ্ঞতা জানাইতে চাহে, নারীহৃদয়ের অসীম কৃতজ্ঞতার দুইটি কথায় বিদায়ের শঙ্কাশরমহীন লগ্নটুকু ভরিয়া যাইতে চাহে।

তখনও বিনিদ্র রজনীর নেশা মাথার মধ্যে পাক দিতেছিল। মনে মনে এই ব্রীড়ানতা কুণ্ঠিতা মূর্ত্তিকে ডাকিয়া বলিলাম, না, হে সুন্দরি, আর কৃতজ্ঞতার আবশ্যক নাই। একটি রাত্রির জন্য তুমি যে আমার দেহের এত কাছে এবং মনের এমন গভীর অন্তস্তলে প্রবাস করিয়া গেলে, সেই আমার মহা-পুরস্কার। হে মৌনে, আকাশের ওই অস্তমান নক্ষত্রের মত তুমি রজনীর এক প্রান্ত হইতে উদয় হইয়া অন্য প্রান্তে বিলীন হইতে চলিয়াছ। তোমার আদি রহস্যে, তোমার অবসান রহস্যে, এই দুই সীমাহীন রহস্যের মাঝখানে একটি রাতের

আধ-বাস্তবতার মধ্যে তুমি আমার কাছে যে জাগিয়া উঠিয়াছিলে, সেই আমার মহাসম্পদ, সেজন্য তুমিই আমার সমস্ত মনপ্রাণের কৃতজ্ঞতা গ্রহণ কর।

গার্ড হুইস্‌ল দিল, সঙ্গে সঙ্গে অবগুণ্ঠন উন্মুক্ত হইল এবং ফিক করিয়া একটু হাসি।—

ইয়া গোঁফ, একমুখ ছাঁটা দাড়ি, ক্ষুর দিয়া কামানো মাথা, রগ বসা, গাল তোবড়ানো, দুশমন কালো এবং হাতে পায়ে সুকৌশলে ঈষৎ হলুদ রঙের সঙ্গে খড়ি মাখানো।

হাসিটা কান হইতে কান পর্য্যন্ত প্রসারিত করিয়া বলিল, সেলাম আলেকুম কর্ত্তা; গোস্তাকি লেবেন না, আওরাতের ওপর কর্ত্তার বেজায় নেকনজর দেখি—হি—হি—হি। সব খোদার মর্জ্জি, মাঝ হতে আমার একটু ফায়দা হয়ে গেল—হি—হি—হি।

গাড়ি ছাড়িয়া দিল। লোক ডাকিব কি, আমার বাকরোধ হইয়া গিয়াছিল। চেন টানিবার কথাটা তো মনেই আসিল না। ভ্যাবা-গঙ্গারাম হইয়া বসিয়া রহিলাম।

সেই উৎকট হাসি লইয়া গাড়ির সঙ্গে সঙ্গে দুই পা চলিতে চলিতে বলিল, আবার সেলাম আলেকুম, চললাম, জরদার কৌটোটা আশনাইয়ের নেশানা ক'রে রাখলাম কর্ত্তা, এই চাদর আর সিল্‌ভারের ঘটির সাথে খুব মানাবে—হি—হি—হি। অধীনের নাম অছিমুদ্দিন, মেহেরবানি ক'রে ইয়াদ রাখবেন।

হার-জিত

১

শেখরের সহিত তাহার স্ত্রী অরুণার কলহ বাধিয়াছে। শাস্ত্রকাররা বলেন, দম্পতিদের মধ্যে এ জাতীয় ঘটনা নাকি বিপজ্জনক নয়। কিন্তু এক্ষেত্রে যেন একটু চিন্তার বিষয় হইয়া উঠিতেছে, কারণ অরুণা কথায় কথায় বলিয়া বসিল, আমি চললাম বাপের বাড়ি—আজই।

শেখর নিশ্চয় একটু ভয় পাইল, কথাটাকে হালকা করিয়া ফেলিবার জন্য একটু রসিকতা করিবার চেষ্টা করিল, বলিল, বেশ, তাই চল।

কিন্তু ফল হইল উল্টা। স্ত্রী রসিকতার জবাব না দিয়া আরও গম্ভীর হইয়া বলিল, আর মণ্টু ডলি কেউ সঙ্গে যাবে না। ভোগো। কেন, আমিই বা সর্ব্বত্র টাঙিয়ে নিয়ে বেড়াব কেন?

শেখর বলিল, না, ওদের মাসী তো আসছেই, ভালও বাসে। কথাটা আমার মনেই ছিল না। তা হ'লে তোমার সঙ্গে যাবার আমারও আর তাড়া নেই।

অরুণা আজ সকালে ছোট ভগ্নীকে আসিবার জন্য তাহার শ্বশুরালয়ে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইয়াছিল। স্বামীর দিকে কড়া চোখে চাহিয়া বলিল, আমি নেই, অথচ সে এসে থাকবে? বুদ্ধিশুদ্ধি কি লোপ পেল নাকি?

শেখর ঠোঁটে হাসি চাপিয়া বলিল, আমি তো মনে করি, তুমি থাকবে না ব'লেই তার থাকাটা আরও দরকার। একজন প্রতিভূ দিয়ে না গেলে আমারই বা—

অরুণা আর শেষ করিতে দিল না, সংক্ষেপে অথচ দৃঢ়তার সহিত বলিল, স্ত্রী আর দাসী নেই।

শেখর বলিল, না, আমি অভিভাবকের কথাই বলছিলাম। স্বামী এখনও নৌকোটিই হয়ে আছে কিনা, তার অষ্টপ্রহর একটি কর্ণধার না থাকলে—

কান নেহাত চুলকোয়, সরী যখন এর পর আসবে দেখা যাবে। এখন রসিকতা থাক্। আমি চললাম আজ। সেখানে ডাকতে গিয়ে যেন বেহায়াপনা না করা হয়। ঝি!

তার সূত্রপাত তো তুমিই করছ। একে তো সেখানে যাওয়ার কোনও সঙ্গত কারণ নেই, ঝগড়ার সন্দেহ করবেই সব। তবু যেন গেলেই। তারপর তারা যদি দুদিন থাকবার জন্যে জিদ করে, তখন তোমার আমার ওপর টান ধরবে। চোখ রাঙালেই তো হয় না, সত্যি কথাই বলছি। আমার এই আকর্ষণের ক্ষমতাটাতে গৌরব আছে বটে, কিন্তু—

অরুণা আরও জোরে ডাকিল, ঝি! কানের মাথা খেয়েছিস?

ঝি আসিতেইছিল; একটু পা চালাইয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। অরুণা বলিল, শোফারকে ডেকে দে নীচে, আর দেখ্, ডলি আর মণ্টুকে একটু সাজিয়ে-গুজিয়ে রাখ্, ওদের মামার বাড়ি যাবে।

ঝি চলিয়া গেলে শেখর বলিল, এই না অন্য রকম হুকুম হয়েছিল?

খুশি। এতে টিপ্পনীর কোনও দরকার নেই। যদি ভাল না লেগে থাকে—

না, মতটা যে কথায় কথায় বদলায়, সেই কথাটাই মনে করিয়ে দিচ্ছিলাম।

বদলাবার উদ্দেশ্য থাকলে বদলায়। যে দুটোর জন্যে টান, তারা

সঙ্গেই থাকবে—বাস্, নির্ঝঞ্ঝাট। আর কারুর জন্তে আমি ভাবি না, একটুও না। এইবারে ভুল ধারণাগুলো বেশ ভাল ক'রে ভেঙে দিতে চাই। এই চাবির থোলো—সব জায়গার চাবি এতেই আছে। আর আমায় জ্বালাতন করবার কোনই দরকার নেই।

টেবিলের উপর চাবির গুচ্ছটা ঝনাৎ করিয়া আছাড় খাইয়া পড়িল। পর্দ্দার বাহির হইতে ঝি খবর দিল, শোফার নীচে দাঁড়াইয়া আছে। শেখর বিনীতভাবে বলিল, কি বলব ?

আমি বলতে জানি, উপকারে দরকার নেই।

বারান্দায় গিয়া শোফারকে বলিল, পাঁচটার সময় গাড়ি তোয়ের থাকবে, চন্দননগর যাবে। দরোয়ানকেও তোয়ের থাকতে বল ; আর চট ক'রে বাগবাজারে সরীর বাড়িতে গিয়ে খবর দিয়ে আস্থক—বিশেষ কাজ থাকায় আমি চন্দননগর যাচ্ছি। আবার না এসে পড়ে, বরং দরোয়ানকে পাঠিয়ে দাও, একটা চিঠি নিয়ে যাক।

ঘরে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, শেখর চাবির গুচ্ছটা হাতে লুফিতে লুফিতে মৃদু মৃদু হাসিতেছে। সন্দিগ্ধভাবে প্রশ্ন করিল, কি ?

শেখর সহজভাবে বলিল, কই, কিছু না তো !

দ্বিগুণ সন্দেহে অরুণা বলিল, নিশ্চয় কিছু, বলতে হবে।

আজ আমি হুকুমের বাইরে এসে পড়েছি না ?

অরুণা রাগের উপর আবার অভিমান করিয়া বলিল, ও। আচ্ছা, থাক্।

তবুও দয়া ক'রে বলতে পারি।

কিছু দরকার নেই। উঃ, দয়া !

শুনলে যাওয়ার শখটা আর থাকত না। অনেক হাঙ্গাম পোয়ানো থেকে বাঁচা যেত—উভয় পক্ষেরই।

অরুণা ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া ক্ষণমাত্র চিন্তা করিল। বোধ হয়, এখানে হাঙ্গামা পোহানোর অর্থ কি হইতে পারে, নিজের আন্দাজমত স্থির করিয়া লইল; তাহার পর বলিল, থাক্, হাঙ্গামার ভয় আমি করি না; যার ভয় আছে, সে সাবধান হোক।

তা হ'লে দয়া ক'রে শোনই না হয়। আর কিছু নয়, কথাটা হচ্ছে—

না না, আমি দয়া করতে চাই না কাউকে। আমার শরীরে কি দয়ামায়া আছে? আমি কি একটা মানুষের মধ্যে? তা হ'লে কি আমার কথায় কথায় এত হেনস্তা হয়? দয়ামায়া যে মানুষ জীবনে পেয়েছে কখনও, সেই জানে, দয়ামায়া কি! আমি কি কারুর কাছে কখনও—

অরুণা চক্ষে দিবার জন্য হাতে আঁচলের একটা কোণ তুলিয়া লইল। শেখর উদ্‌গ্রীব হইয়া চাহিয়া রহিল, কারণ এসব স্থলে কান্না নামিলে অনেকটা আশা, কিন্তু সে শান্তিজল বর্ষিত হইবার পূর্ব্বেই দরোয়ান আসিয়া বাহিরে সেলাম করিয়া দাঁড়াইল।

অরুণা বলিল, দাঁড়াও, চিঠি দিই।

পাশের ঘর হইতে চিঠি লিখিয়া আনিয়া দরোয়ানের হাতে দিয়া, তাহাকে দুই-একটা উপদেশ দিয়া বিদায় করিল।

শেখর বলিল, তা হ'লে পাকা হয়ে গেল?

অরুণা তাহার দিকে না চাহিয়াই বলিল, আমার সব কাজই পাকা।

কিন্তু চাণক্য বলেছেন—দাম্পত্যকলহে চৈব, খুব পাকাপাকি হ'লেও নাকি—

অরুণা সেই ভাবেই বলিল, চাণক্য ঠিকই বলেছেন, পুরুষেরা গায়ে

প'ড়ে মিটিয়ে নেয়। বোধ হয়, কোনও বিশেষ দিনের ঘটনা স্মরণ করাইয়া দিবার জন্য স্বামীর দিকে কটাক্ষ করিয়া বলিল, কখনও কখনও পায়ে ধ'রেও।

কে পায়ে এসে পড়ে এইবার, তার বড় রকম সাক্ষী রাখব। কথাটা মনে থাকে যেন।

শেখর নীচে নামিয়া গেল। বৈঠকখানায় টেবিলের দেরাজ হইতে টাইম-টেব্‌লটা বাহির করিয়া একবার দেখিয়া লইল।

তিনটা চল্লিশ হইয়া গিয়াছে। চারটা পাঁচে একটা গাড়ি, সেটা পাইবার কোনও আশা নাই। তাহার পরের গাড়িটা পাঁচটা পনরোয়। অরুণার মোটর যদি পাঁচটার সময়ই ছাড়ে তো তাহার প্ল্যানটা আর খাটে না।

একটু চিন্তা করিল, তাহার পর টেবিলের উপর একটা নিষ্পত্তিসূচক আঘাত দিয়া অস্ফুটভাবে বলিল, হয়েছে।

উপরে গিয়া শোফারকে নীচের উঠানে ডাকিয়া পাঠাইল। অরুণাকে শুনাইয়া শুনাইয়া বলিল, যেতে আসতে প্রায় পঞ্চাশ মাইল। গাড়িটা ঠিক আছে তো?

অরুণা আসিয়া উৎকর্ণ হইয়া দুয়ারের নিকট দাঁড়াইল।

মোটর জিনিসটা একেবারে ঠিক কখনও থাকে না। শোফার একটু চিন্তা করিয়া বলিল, চ'লে যাবে হুজুর।

অরুণা 'তা হ'লে' বলিয়া কি বলিতে যাইতেছিল, শেখর তাহার কথা চাপা দিয়া বলিল, চ'লে যাওয়া-যাওয়ি নয়। খালি মেয়েদের নিয়ে যাচ্ছ। এরা সব জিদ করছে বটে, কিন্তু আমি সঙ্গে যেতে পারছি না। এখুনি বিশেষ কাজে বেরুতে হবে, বেশ ক'রে ভেবে দেখ। কিছু হ'লে বাড়িতে যদি টেলিগ্রামও কর তো ঘণ্টা-ছয়েকের আগে আমি পাব না।

এরূপ কথার উপর ছোটখাটো খুঁত থাকিলেও প্রকাণ্ড হইয়া পড়ে। শোফার বলিল, ব্রেকটা একটা চাকায় যেন একটু আলগা ধরছে, তাতে তো বিশেষ ক্ষতি নেই, আর খুলতে গেলেও ঘণ্টা-দুয়েকের কমে হবে না।

পৌনে চারটে হয়েছে, পৌনে ছটা, ধর ছটাই।—হিসাবটুকু সারিয়া স্ত্রীর দিকে চাহিয়া আস্তে আস্তে বলিল, এক ঘণ্টা দেরি হ'লে মশাইয়ের রাগ প'ড়ে যাবার ভয় আছে কি? আমি তো ব্রেকটাকে বিশেষ ছোট ব'লে মনে করি না। সেদিন বউবাজারের মোড়ে যা কাণ্ড দেখলাম, মনে হ'লে গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে, এক গাড়ি মেয়েছেলে ঠাসা, হঠাৎ—

অরুণা ভয় চাপিবার চেষ্টা করিয়া সিধা শোফারকেই বলিল, না না, তুমি একবার খুলে ঠিকঠাক ক'রে নাও, হোকগে একটু দেরি।

শেখর অধর দংশন করিয়া অনেক কষ্টে হাস্যসংবরণ করিল। অরুণা অস্বস্তির সহিত প্রশ্ন করিল, কোথায় যাওয়া হবে বাবুর?

উত্তর না পাইয়া আবার জিজ্ঞাসা করিল, কখন আসা হবে?

দেখি কখন ছাড়ে, সেখানে তো জোর নেই নিজের।

কোন্‌খানে?

কোনখানেই নয়। যার নিজের স্ত্রীর ওপরেই জোর রইল না—

ধাঁধার মধ্যে পড়িয়া অরুণা উষ্ণ হইয়া উঠিতেছিল, বলিল, স্ত্রীর ওপর জোর না করতে পারলে বাবুরা সব হাঁপিয়ে ওঠেন। ইস, জোর! জোরটা কিসের শুনি?

খোশামোদের।

অরুণা হাসিয়া ফেলিল; কিন্তু রাগের সময় হাসিয়া ফেলাটা একটা পরাজয় বলিয়া রাগটা বাড়িয়াই যায়। তাই নিজেকে কষ্টে সংবৃত

করিয়া লইয়া বেশি রকম চটাচটি করিবার জন্য বলিল, যেখানে খুশি যাও, আমার দেখা আবার ছ মাস পরে।

শেখর ফিরিয়া বলিল, ছ ঘণ্টার মধ্যে সেধে দেখা করবে।

অরুণা আরও রাগিয়া বলিল, তা হ'লে ছ বচ্ছরের ভেতর যদি এ বাড়ি মাড়াই তো—

শেখর বলিল, আর ছ ঘণ্টা পরে যদি ফিরে না আসতে হয় তো—

অরুণা রাগে গরগর করিতে করিতে দুইটা ঘর পার হইয়া গিয়াছিল, সেইখান হইতেই চেঁচাইয়া বলিল, দেখা যাবে।

শেখর আর জবাব দিল না, বারান্দার রেলিঙে ঝুঁকিয়া মিটিমিটি হাসিতে লাগিল।

২

চন্দননগরে গঙ্গার ধারে বাড়িটা, পিছনে গঙ্গা, সামনে রাস্তা, বাড়ির সামনে খানিকটা বাগান।

শেখর আধ ঘণ্টা হইল আসিয়াছে। হাত-পা ধুইয়া জিরাইয়া হঠাৎ এই অভ্যুদয় সম্বন্ধে শ্বশুর-শাশুড়ীকে একটা মনগড়া কারণ দর্শাইল, খানিকটা এ কথা সে কথা লইয়া গল্প করিল, তাহার পর বড় শ্যালিকাকে বলিল, চল শচীদি, বাগানে একটু পায়চারি করিগে।

শ্বশুর বলিলেন, তার চেয়ে গঙ্গার ধারে গিয়ে বসলে পার, হু-হু ক'রে হাওয়া দিচ্ছে।

রাস্তার দিকে থাকাই শেখরের দরকার, বলিল, হ্যাঁ, তাও মন্দ নয়।

কথার মধ্যে অনিচ্ছার রেশটি লক্ষ্য করিয়া শ্যালিকা বলি, তা হ'লেও বাগানটা একটু ঘুরে আসি, এস; কতকগুলো নতুন গোলাপ

বসানো হয়েছে। একটা ব্ল্যাক্‌প্রিন্স যা আনিয়েছি, এ তল্লাটে ও রকম নেই, না বাবা?

আট-নয় বছরের ছোট শালী মলিনা ভগ্নীপতির হাত ধরিয়া টানিতেই শুরু করিয়া দিল; বলিল, আর আমার করবীর ঝাড়ও দেখবেন চলুন জামাইবাবু, গাছ আলো ক'রে আছে। বলতে হবে, কারটা ভাল, হ্যাঁ! ম্যাগগে, কালো আবার গোলাপ! প্রিন্স মানে তো রাজকুমার, আমি সে জানি, তা রাজকুমারই হোক আর কোটালপুত্তুরই হোক, কালো আবার নাকি ভাল হয়! কি পছন্দ দিদির! ম্যাগগে!

শচী লজ্জায় রাঙিয়া উঠিতেছিল, মা মুখ ফিরাইলেন, পিতা বিশেষ কিছু না বুঝিয়াই সরল প্রাণে হাসিতে লাগিলেন। শেখর কথাটা আর বাড়িতে না দিয়া বলিল, চল, তোমার করবী দেখিগে।

আসিতে আসিতে আবার মলিনা ব্ল্যাক্‌প্রিন্স সম্বন্ধে তর্ক তুলিতে যাইতেছিল, দিদি ধমক দিয়া বলিল, আচ্ছা, তুই চুপ কর্, ডেঁপো মেয়ে। শেখরকে জিজ্ঞাসা করিল, এত কাছে রয়েছ মুখুজ্জে, অথচ মাঝে মাঝে যে এক-আধবার আসবে—

শেখর, মলিনা যে কথাটি বলিতে যাইতেছিল, তাহারই উত্তর দিল, কি জান গো মলিনাসুন্দরী, যে যেটাকে ভালবাসে, তার কাছে—

বড় শ্যালিকা রাগিয়া বলিল, ওই বাজে কথাই হ'ল বড়, আর আমার প্রশ্নের বুঝি—

ওর মধ্যেই তোমারও জবাব আছে দিদি, তোমার বোনের ভালবাসার অত্যাচারে আর বেরুবার জো আছে! কি চোখেই যে অধমকে দেখেছেন, দু দণ্ড চোখের আড়াল হবার জো নেই! অমনই জবাবদিহি কর, তাও যদি মনঃপূত না হ'ল তো কান্নাকাটি, রাগ, অভিমান—

কই, এমন তো ছিল না! একটু আবদারে বরাবরই ছিল বটে, কিন্তু—

আজকাল হয়েছে। বন্ধুরা বলে, নাকি ডগ, তোকে দেখে হিংসে হয়। বলি, ক্ষ্যামা দাও ভাই; একদণ্ড বাড়ি ছেড়ে বেরুবার জো নেই, এ ভালবাসা, না কোণঠাসা ক'রে মারা?

শ্যালিকা ভগ্নীর এইরূপ আদর্শ অনুরাগ সমর্থন করিয়া দুঃখিতভাবে বলিল, তোমাদের ভাই প্রাণ খুলে দিলে তোমরা সন্তুষ্ট হও না, আর সঙ্গোপনে দিলে তোমরা তা অনুভবই করতে পার না। ভালবাসা দেওয়ার আর উপায়ই বা আছে কি, স্ত্রী বেচারীরা তো আর ভেবে পায় না।

শেখর বলিল, বুঝলাম শচীদি, সব আমাদেরই দোষ। ইট-পাথরের মত আমরা যে হৃদয়হীন—এ বদনামটা তো চিরদিনই আছে। কিন্তু ধর, এই এখানে এসেছি, কাজটা সারতে চার-পাঁচ দিন লাগবে। ভেবেছি, রোজ যাওয়া-আসা না ক'রে এ কটা দিন এইখানেই থেকে যাই। হঠাৎ তোমার বিরহিণী ভগ্নী বাড়ি-ঘর-দোর বন্ধ ক'রে সব নিয়ে এসে হাজির হলেন, ডবডব করছে চোখ, মুখ ভার, কি রকম আতান্তরে পড়ি বল তো?

শ্যালিকা হাসিয়া বলিল, আমাদের তো লাভই ভাই। অনেকদিন দেখি নি তাদের, তোমাদের যদি কানের টানে মাথা আসে তো মন্দ কি?

শেখর মাঝে মাঝে গোপনে রাস্তার দিকে উৎসুক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিল, বলিল, তা সত্যিই তিনি যদি এসে হাজির হন তো আমি মোটেই আশ্চর্য্য হব না।

মলিনা সব না বুঝিলেও দিদির আসিবার সম্ভাবনায় চঞ্চল হইয়া

উঠিতেছিল, প্রশ্ন করিল, কিসে ক'রে আসবেন জামাইবাবু? মোটরে?

শেখর বলিল, তিনিই জানেন। চাই কি জ্ঞানশূন্য হয়ে 'হা নাথ, হা নাথ' করতে করতে ছুটেও আসতে পারেন।

মলিনা অকৃত্রিম বিস্ময়ে চোখ দুইটা বড় বড় করিয়া বলিল, ও ব্বাবা!

দিদি তাহার রকম দেখিয়া হাসিয়া ফেলিল, বলিল, মর্ পোড়ারমুখী, দিদি কি তোর পাগল হয়েছে নাকি?

শেখর বলিল, আমি ভাবছি, যদি সত্যিই এসে পড়ে তো বাবা মা কি ভাববেন?

কি আর ভাববেন? বললেই হবে, ওরা মোটরে বেড়াতে বেড়াতে এসেছে, তোমার রেলপথে একটু কাজ ছিল। কিন্তু কোথায় কি তার ঠিক নেই, মিছে মাথা ঘামানো।

তার আসবার কথা তো তাঁদের বলা হয় নি!

ভুলে গিয়েছিলে। চল্ মলি, তোর করবী দেখাবি চল্।

আগে তোমার গোলাপ দেখুন। তুলে আনি একটা?

দিদি ধমকাইয়া বলিল, না।

শেখর বলিল, পরের জিনিসে এত লোভ কেন মলিনা? ছিঃ!

মলিনা হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল, ওমা, দিদির জিনিস বুঝি পরের জিনিস হ'ল? বুদ্ধি যা হোক!

শেখর উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল, এবং লজ্জিতা হইয়া পড়িলেও মলিনার দিদি না হাসিয়া পারিল না। বলিল, কি হচ্ছে ছেলেমানুষের সঙ্গে?

শেখর বলিল, খুব সলা দিলে তো দিদি! ওঁদের বলব, ভুলে গিয়েছিলাম? নিজের স্ত্রী সম্বন্ধে এত ভুল, আর সে স্ত্রী আবার ওঁদেরই মেয়ে! তার চেয়ে বললেই হয়—

শচী বিরক্তির ভান করিয়া বলিল, দেখ দেখি পাগলামি! কে আসছে তার ঠিক নেই, ক্রমাগতই বাজে কথা! আমার বোনটিরই দোষ দিচ্ছ, কিন্তু আসা পর্য্যন্ত তো দেখছি, তার কাছে মনটি প'ড়ে আছে; টান কার বেশি, তা তো বুঝতেই পারলাম না।—বলিয়া মুখের দিকে চাহিয়া একটু ক্রূরভাবে হাসিল।

কথাটা সত্য। মোটরের ভাবনাটা মনের মধ্যে জাঁকিয়া থাকায় শেখর যে ক্রমাগতই স্ত্রীর প্রসঙ্গ চালাইয়া আসিতেছে, সে বিষয়ে তেমন সতর্ক ছিল না, একটু অপ্রতিভও হইয়া পড়িল।

মলিনা ফুলের তোড়া বাঁধিতেছিল, গম্ভীর মুখে বলিল, মা বলছিলেন না দিদি, আহা, দুটিতে মনের বেশ মিল আছে—ভগবানের ইচ্ছেয়।

শেখরের লজ্জার পালা পড়িয়াছে।

স্নেহভরে ভগ্নীর কাঁধে একটি হাত দিয়া দিদি বলিল, আর বলছিলেন, মলিনারও ওই রকম একটি মনের মিলের বর হয়!

ধ্যাৎ!—বলিয়া মলিনা মাথা নীচু করিল।

শচী বলিল, চল, এবার গঙ্গার ধারে যাই, বাবা বোধ হয় ওই দিকে গিয়েই বসেছেন।

মলিনা বলিল, বাঃ, আর তোমার ব্র্যাক্‌প্রিন্স দেখালে না? তা হ'লে কি ক'রে বলবেন যে—

সরলপ্রাণা ভগ্নী ও চতুর ভগ্নীপতি মিলিয়া শখের ফুল দেখাইবার মত তাহার আর অবস্থা রাখে নাই। শচী লজ্জিতভাবে বলিল, নাঃ, থাক্‌গে।

ভগ্নী আবদার ধরিয়া বলিল, না না, দেখাবে চল। আচ্ছা বাবু, আমি বলছি, আমার হিংসে হবে না; ভয় নেই।

দিদির ব্রীড়াভারাক্রান্ত চোখ দুইটা অবাধ্যভাবেই একবার ভগ্নীপতির মুখের উপর পড়িল। চকিতে সে দুইটাকে ভূমিনত করিয়া বলিল, পোড়ার বাঁদর মেয়ে!

শেখর হাসিতে হাসিতে বলিল, তোমার হিংসের ভয় করছেন না মলিনা, উনি ভয় করছেন বোধ হয় আমাদের হিংসের।

না, আমি চললাম। তোমরা দুই রসিকে থাক।—বলিয়া কৃত্রিম রাগ দেখাইয়া শচী যাইবার জন্য পা বাড়াইতেই, উপস্থিতির একটা দীর্ঘ হর্ন দিয়া গেটের সামনে একটা মোটর আসিয়া দাঁড়াইল।

কে এল?—বলিয়া শচী গ্রীবা ঘুরাইয়া দাঁড়াইল। মলিনা 'ওমা, মেজদিদি যে!' বলিয়া আগে সংবাদ দিবার জন্য বাড়ির দিকে ছুটিল। শেখর বিস্ময়ের ভান করিয়া বলিল, দেখলে তো দিদি?

শ্যালিকা রহস্য ভেদ করিবার চেষ্টা করিয়া একটা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হানিল। পরমুহূর্ত্তেই বলিল, দাঁড়াও ভাই, আগে নামাইগে ওদের।—বলিয়া দ্রুতপদে আগাইয়া গেল।

শেখর দুই-একটা গাছের আড়ালে আড়ালে একটু গা-ঢাকা দিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইল।

শচী অরুণার কোল হইতে ডলিকে লইল, মণ্টুর হাত ধরিয়া নামাইল, তাহার পর ভগ্নীকে বলিল, এস, অগ্রদূত তোমার হাজির।

অরুণা মোটর হইতে নামিল, ভগ্নীর রসিকতা বুঝিবার কোন চেষ্টা না করিয়া 'সবাই ভাল আছ তো দিদি?' বলিয়া ভগ্নীর পদধূলি গ্রহণ করিবার জন্য প্রণত হইল।

এই সময়টিতে শেখর ঝোপের অন্তরাল হইতে সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। মুহূর্ত্তের মধ্যে মণ্টু 'বাবা, বাবা! ওমা, বাবা গো!' বলিয়া আহ্লাদে চীৎকার করিয়া উঠিল এবং ডলিও মাসীর কাঁধ বাহিয়া বাপের কোলে যাইবার জন্য ব্যগ্রভাবে দুইটি কচি হাত বাড়াইয়া দিল।

অরুণা চকিতে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং স্বামী-স্ত্রীতে চোখোচোখি হইল।

৩

দুইজনে দাঁড়াইয়া রহিল যেন বায়স্কোপের দুইখানি ছবি, মুখে রা নাই, উগ্র বিস্ময়ের ভাব মুখ এবং সমস্ত শরীর দিয়া যেন ফুটিয়া বাহির হইতেছে। বিশেষ করিয়া শেখরের বিস্ময়টা চেষ্টাপ্রসূত বলিয়া আর্ট যেন তাহার মধ্যে মূর্ত্তি ধরিয়া উঠিয়াছে। লোকটির থিয়েটারে নাম আছে, এই অরুণাই কত প্রশংসা করিয়াছে।

শেখরই প্রথমে কথা কহিল, তুমি হঠাৎ?

অরুণা বেচারীর মুখে কোন কথাই যোগাইতেছিল না। অসহায়-ভাবে বলিল, হঠাৎ কি?

শেখর একবার বক্র ইঙ্গিতে শ্যালিকার দিকে চাহিল। তাহার পর স্ত্রীর দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল, না, ঠিক হঠাৎ না বটে; কিন্তু তোমায় অত ক'রে বারণ ক'রে এলাম।

স্ত্রী বিমূঢ়ভাবে বলিল, কি বারণ করলে?

মলিনা আসিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, শেখর এবার তাহার দিকে চাহিয়া বলিল, এই দেখ মলিনা, একেই বলে জ্ঞানশূন্য হওয়া, তোমায় এক্ষুনি

বলছিলাম না? অর্থাৎ আমার আসবার কথায় তোমার দিদির মনটা এমনই বিকল হয়ে গিয়েছিল যে, এক ঘণ্টা ধ'রে যে অত ওকে বোঝালাম, সেসব কথা এক্কেবারেই মনে নেই।

মলিনা আশ্চর্য্যে হাঁ করিয়া বলিল, ও ব্বাবা! হ্যাঁ দিদি?

অরুণা শচীর দিকে চাহিয়া বলিল, কি ব্যাপার বল দেখি দিদি?

শচী স্পষ্ট কিছু না বুঝিলেও কিছু একটা কৌতুকের আভাস পাইয়া বলিল, ব্যাপার তোমরাই জান ভাই। এখন চল, বাবা মা বারান্দায় দাঁড়িয়ে রয়েছেন, পরে বোঝাপড়া হবে 'খন।

অরুণার চলিবার অবস্থাই ছিল না। স্বামীর দিকে চাহিয়া বলিল, তুমি এখানে হঠাৎ যে?

স্বামী অবিচলিতভাবে বলিল, এটা আমার শ্বশুরবাড়ি।—যেন ভূত-গ্রস্তের সঙ্গে কথা বলিতেছে, মেলা কথা বলিবার দরকার নাই।

দুইজনে মুখামুখি হইয়া একটু চুপ করিয়া রহিল। শেখরই মৌনতা ভঙ্গ করিল, যাক, যখন এসে পড়েছ, উপায় নেই। মেলা লজ্জা পেয়েই বা আর কি হবে? দিদিকে অনেকটা ব'লে রেখেছি তোমার রোগের কথা।

অরুণা সোৎসুক নেত্রে তাহার দিদিকে প্রশ্ন করিল, কি রোগের কথা দিদি?

শেখর আবার কহিল, তোমার গিয়ে—আসবার সময় চাবি কার কাছে—

অরুণা গ্রীবা বাঁকাইয়া কহিল, চাবি? চাবি তো তোমার হাতেই দিলাম তখন।

শেখর ঈষৎ হাসিয়া মলিনার দিকে চাহিয়া কহিল, দেখছ তো

মলিনা? স্বামীকে না দেখতে পেলে এই রকমই হয়। অবশ্য তোমাদের বোনের একটু বাড়াবাড়িই দেখছি।

স্ত্রীকে বলিল, তুমি আসবার সময় আমার হাতটাই যে সেখানে ছিল না। অবশ্য মনটা কিছু কিছু ছিল, কিন্তু—

অরুণা দিদির দিকে চাহিয়া ব্যাকুলভাবে কহিল, কি রোগের কথা বলেছে বল না দিদি? আমি, বাপু, এ লোকের সঙ্গে আর পেরে উঠি না।

দিদি তাহার হাতটা ধরিয়া হাসিয়া বলিল, বলছি। আগে চল্ ওদিকে, বাবা মা এগিয়ে আসছেন, কি ভাবছেন জানি না।

চলিতে চলিতে বলিল, রোগ আবার কি? বাবুদের ওটুকু না হ'লেও দিশেহারা হন, অথচ ঠাট্টাও করা চাই। তুই একলাটি থাকতে না পেরে চ'লে আসবি, সেই কথা আমায় বলা হচ্ছিল। তা এতে আর দোষ কি হয়েছে? আর তা ছাড়া এসে ভালই করেছিস ভাই, আমায় একলা পেয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপে—

অরুণা গালে চারটি আঙুল চাপিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। ক্ষণমাত্র চিন্তা করিল, স্বামীর দিকে সরোষ নেত্রে চাহিল। তাহার পর দিদির দিকে ফিরিয়া বলিল, ও হরি! বুঝেছি। এতক্ষণ পরে সব কথা বুঝতে পেরেছি। কি মতলববাজ লোক ভাই! এইজন্যেই বুঝি তখন বললে, ছ ঘণ্টার মধ্যে দেখা হবে!

শেখর শ্যালিকাকে মধ্যস্থ মানিয়া বলিল, কি করব শচীদি? যে রকম কাতরানি, চোখের জল। কাজেই ব'লে আসতে হয়েছিল, আজ রাত্রেই ফিরে আসব, ছ ঘণ্টার বেশি দেরি হবে না। একেবারেই কাছছাড়া হতে দেবে না।

একটা কুটিল জবাব ঠোঁটে আসিল এবং কোন সঙ্গত উত্তর দিতে

না পারায় রাগের মাথায় অরুণা সেইটাই দিয়া বসিল, বলিল, হ্যাঁ, ঠিকই তো, এক দণ্ড তোমাদের বিশ্বাস ক'রে ছাড়া চলে না, তোমরা এমনই।

শেখর দুঃখের অভিনয় করিয়া সঙ্গে সঙ্গে বলিল, ছিঃ অরুণা, এটা এক হিসেবে যে শচীদিদিকেও বলা হ'ল। কি মনে করবেন উনি বল দেখি?

বিদ্রূপটা বুঝিতে না পারিয়া অরুণা বিস্ময়ে এবং ভয়ে চক্ষু বড় করিয়া কহিল, ওমা, দিদিকে আবার কি বললাম! দেখ দেখি!

দিদি বুঝিয়াছিল, ওদিকে বাবা মা কাছে আসিয়া পড়িয়াছিলেন, আস্তে আস্তে বলিল, তোরা একটু চুপ কর্ বাপু, মুখুজ্জের মুখের কি কোন আড় আছে যে, ওর সঙ্গে তর্ক করছিস অরু?

মণ্টু গিয়া দিদিমার কোল দখল করিয়াছিল। অরুণার পিতা লাঠিতে ভর দিয়া আস্তে আস্তে আসিতেছিলেন, একটু দূর হইতেই বলিলেন, বাঃ, অরুণাও এসেছে! বেশ হয়েছে। কিন্তু কই, শেখর আমায় কিছু বল নি তো?

শচীই উত্তর দিল, অরুর আসবার কোন ঠিক ছিল না বাবা, তাই বলেন নি। ওর এক বন্ধু বেড়াতে এসেছিল, তাকে বিদায় ক'রে সময় থাকলে অরু মোটরে আসবে—এই রকম কথা ছিল।

এর পরে যে প্রশ্ন হইবে, তাহার উত্তর শেখর পূর্ব্ব হইতেই দিয়া রাখিল, আমিও সঙ্গেই আসতাম। বিকেলে বস্তিবাটিতে একটু কাজ ছিল, তাই আগেই বেরিয়ে পড়ি।

তাহার জন্যই এই সব মিথ্যার সৃষ্টি—বিশেষ করিয়া দিদির তরফ হইতে। অরুণা লজ্জায় যেন পা উঠাইতে পারিতেছিল না। স্বামীটি পূর্ব্বে আসিয়া আরও কি সব গাহিয়া রাখিয়াছে, সে কথা ভাবিয়া সে

নিতান্ত অস্বস্তি বোধ করিতেছিল। দিদির তো এক রকম ধারণাই জন্মাইয়া দিয়াছে যে, সে স্বামীর টানেই পিত্রালয়ে আসিয়াছে। ছি ছি, সাংঘাতিক লোক—সব পারে!

কথাবার্ত্তা, স্বামীর দিকে কখন মিনতির নরম চোখে চাহিয়া, কখন রাগের কড়া চোখ দেখাইয়া খুব সন্তর্পণে চালাইয়া গেল। শ্বশুর-শাশুড়ীর কাছেও একটু-আধটু বেহায়াপনার ইঙ্গিত করিয়া দেওয়া ওর পক্ষে আশ্চর্য্য নয়। মনে মনে বলিল, ঘাট হয়েছে বাপু, আর তোমার সঙ্গে লাগব না।

জিরাইয়া কিঞ্চিৎ জলযোগের পর সকলে গঙ্গার ধারে গিয়া বসিল। পিতা কিছুক্ষণ পরে উঠিয়া আসিলেন—জ'লো হাওয়া তাঁহার লাগানো মানা। মাতাও একটু পরে উঠিলেন। শেখর হাঁপাইয়া উঠিতেছিল, এইবার মুখ খুলিবার একটু সুযোগ পাইল।

কহিল, আমাদের হিন্দু-ললনাদের সুখ্যাতি এতদিন ধ'রে যে কীর্ত্তিত হয়ে এসেছে—

অরুণা একবার মুখের দিকে সন্দিগ্ধভাবে চাহিয়া বলিল, আচ্ছা, হয়ে আসুকগে, তুমি থাম।

না, তোমার আজকের এই পাতিব্রত্যের নিদর্শনটুকু দেখেও যদি সেটুকুর কদর না করি তো ঘোর অকৃতজ্ঞতা—

অরুণা উত্যক্ত হইয়া বলিল, ওগো, আমি হার মানলাম, আমার ঘাট হয়েছে, আর দিদির সামনে বেহায়াপনা ক'রো না, তোমার পায়ে ধরি।

শেখর মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল; আস্তে আস্তে—যেন নিজের মনেই বলিল, পায়ে ধরাটা শুনেছি নাকি আমাদেরই একচেটে হয়ে গেছে।

আজ বিকালেরই কথা।

অরুণা একটু আড়ে না চাহিয়া পারিল না। কথাগুলা চাপা দেওয়ার জন্য বলিল, আর তোমাদের অন্য কথা নেই দিদি?

শচী বলিল, মুখুজ্জে আজ আমাদের অতিথি। শুধু তোর চর্চ্চা করতেই যদি আজ পছন্দ হয়ে থাকে তো কি ব'লে নিরাশ করি, বল্?

অরুণা বলিল, কেন? আমি তো এইটুকু এসেই কথা কইবার অনেক পেয়েছি। এই জায়গাটার কথাই ধরা যাক্ না—কেমন সুন্দর জ্যোৎস্না, খোলা গঙ্গার তীর, কি সুন্দর হাওয়া, আমার তো এই জায়গাটুকুর জন্যে—

শেখর তাড়াতাড়ি বলিল, তা ব'লে তুমি যেন আমাদের দুজনকে রেখে টপ ক'রে উঠে যেও না শচীদি। অরুণা সে ভেবে বলছে না নিশ্চয়।

সে হাসিতে লাগিল। শচীও হাসিয়া মুখ ফিরাইল। অরুণা হঠাৎ থমকিয়া দুইজনের দিকে চাহিল, তাহার পর স্বামীর গূঢ় বিদ্রূপ বুঝিতে পারিয়া লজ্জায় ও রাগে বলিয়া উঠিল, না বাপু, আমি চললাম। কোনখানে গিয়ে একটু সোয়াস্তি নেই। কে জানত বল, এখানেও আগে থাকতে এসে ব'সে আছে?

শেখর শ্যালিকার দিকে চাহিয়া বলিল, ওই কথাটি বোঝাবার জন্যে অরুণা কি রকম ব্যস্ত, দেখছ শচীদি? আমি তখনই ওকে বলেছিলাম, যেও না, বড্ড লজ্জায় প'ড়ে যাবে। কিন্তু চোরা না শোনে ধর্ম্মের কাহিনী। বলে, সে আমি সামলে নোব 'খন, কেউ বুঝতে পারবে না।

অরুণা জ্বালাতন হইয়া বলিল, বাবা বাবা! তোমার কি লজ্জা-শরম কিছু নেই গা?

শেখর কহিল, খুব আছে। তবে কিনা আসল কথাটা যদি না ব'লে দিই তো শচীদির মনে হতে পারে, এদের মধ্যে কিছু একটা হয়েছে। মিছিমিছি ভাবতে পারেন, মুখুজ্জে বোধ হয় ঝগড়াঝাঁটি ক'রে চ'লে এসেছে, তাই বোনটি পেছনে পেছনে ছুটে এসেছে।

অরুণা ভিতরে ভিতরে যেন জর্জ্জরিত হইয়া গিয়াছিল। তাহার হার তো হইয়াছেই, যদি স্বীকার করিলে স্বামী অব্যাহতি দেয় তো সে রাজি। কিন্তু তাহার সুবিধা কই? আর ইতিমধ্যে অসহায়ভাবে সে কত বিদ্রূপবাণ সহ্য করিবে?

স্বামীর কথায় দম্ভ করিয়া বলিল, ইস, ছুটে আসবে! সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু দিদির দৃষ্টি এড়াইয়া একবার সকরুণ মিনতির নেত্রে চাহিল।

স্বামী নিষ্ঠুর বিজেতারই মত হাস্যকুটিল দৃষ্টি দিয়া তাহার মৌন উত্তর দিল। এই সময় পরাজয়-স্বীকারের একটু সুবিধা হইল।

মলিনা, ডলি আর মণ্টুকে লইয়া অদূরে ছুটাছুটি খেলা করিতেছিল, ডলি কোল হইতে পড়িয়া কাঁদিয়া উঠিল। শচী মলিনাকে ধমক দিয়া ডলিকে তুলিয়া লইবার জন্য ছুটিয়া গেল।

অরুণা একবার চকিতে দেখিয়া লইল, আঘাত কিছু লাগে নাই। তারপর স্বামীর হাতটা খপ করিয়া ধরিয়া বলিল, আমি হার মানছি গো, দয়ামায়া কি নেই একেবারে?

স্বরটা ভারী হইয়া উঠিল।

হাতটা ছাড়িয়া দিয়া একটু সরিয়া গেল, অনুযোগের সুরে বলিল, কি রকম বেহায়াপনা করছ বল দেখি তখন থেকে?

শেখর বলিল, ফিরে যেতে রাজি তো?

কখন?

শেখর হাসিয়া বলিল, ছ ঘণ্টা পরে।

অরুণা অভিমান করিয়া বলিল, এক্ষুনি চল না তার চেয়ে, বাবা-মার সঙ্গে ভাল ক'রে কথাবার্ত্তাও হয় নি! আমার আবার বাপের বাড়ি আসা!

বেশ, কখন যাবে তুমিই বল না হয়—কাল সন্ধ্যেয়?

পরশু। অনেকদিন আসি নি।

এই কি হারের লক্ষণ?

অরুণা চোখের কোণে চাহিয়া বলিল, ইস, একজনের কাছে আমার হার আছে নাকি?

শেখর একটু হাসিল, বলিল, বেশ, তাই হবে; পরশুই রইল।

মলিনা, মণ্টু ও ডলিকে লইয়া শচী রেলিঙের ধারে দাঁড়াইয়া'ছিল। গঙ্গার নৌকা-স্টীমার দেখাইয়া ডলিকে ভুলাইতেছিল, এদিকে দম্পতিকে একটু সুবিধা করিয়া দেওয়াই বোধ হয় মুখ্য উদ্দেশ্য।

খানিকক্ষণ চুপ করিয়া সামনের দিকে চাহিয়া শেখর বলিল, বড় চমৎকার জ্যোৎস্নাটি।

স্ত্রী ঘাড় বাঁকাইয়া একটু আড়ে চাহিয়া বলিল, নাঃ, সে সব হবে না—দিদি এক্ষুনি যদি ফিরে চান?

শেখর পত্নীর কাছে একটু সরিয়া গিয়া তাহার কাঁধ স্পর্শ করিয়া মৃদু স্বরে বলিল, দিদি অতবড় বোকা নয়—এটা বেশ জেনো।

S S Senapati (22
02/10/94